চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৩৫ সন

১১/৪

শ্রীসুধীরচন্দ্র সেন রায়

ডাক বার্ষিক মূল্য [illegible] টাকা

চতুর্থ বর্ষ]   আশ্বিন, ১৩৩৫   [প্রথম সংখ্যা

ছায়াপথ

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ

হে সুদূর ছায়া পথ,
ধরা হতে প্রতি রাত্রে দেখিবারে পাই,
আকাশ ছাইয়া আছ বাষ্পের মতন,
শুভ্র সুকুমার যেন, কোন মূর্ত্তি নাই,
অবিচ্ছিন্ন ভাবরাশি জানে যেই জন
সেই জানে মূর্ত্তি তব, জানে তার মাঝে,
কতলক্ষ গ্রহ-তারা অলক্ষ্যে বিরাজে।

নিভৃত অন্তর মাঝে নিত্য অনিবার
যে বিচিত্র ভাবস্রোত করে সঞ্চরণ,
মুগ্ধ করি সমগ্র হৃদয়, মূর্ত্তি তার
দেখা দিল মোর হাতে বাষ্পের মতন,
যদি ধরিতেন তুলি কোন শক্তিমান
মুহূর্ত্তে উঠিত ফুটে জ্যোতিষ্ক প্রমাণ!

হে মোর অন্তরতম, পরাণ বল্লভ,
বিরহ ব্যথার স্মৃতি এই সব গান,
এই আর্ত্ত আকুলতা, এ চিত্ত বিপ্লব,
এই শূন্য আলিঙ্গন, এস্বপ্ন প্রয়াণ,
অন্যে দেখে বাষ্পসম, হায় বাষ্প নয়,
তুমি জান এ আমার অশ্রুর সঞ্চয়।

নিশীথের আলো

শ্রীপ্রভাবতীদেবী সরস্বতী

(২২)

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে হরিঘোষ যখন ফিরিয়া আসিলেন প্রণতি তখনও সেইখানে বসিয়া আছে, সম্মুখে এনভেলাপখানা তেমনই অবস্থায় পড়িয়া।

তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া প্রণতি বলিল, "বসুন পত্রখানা আমি এখনও পড়তে পারিনি, কিন্তু না পড়লেও আমি বুঝেছি আপনি নীলার বিয়ের জন্যে এসেছেন। আমি আপনাকে কথা দিয়েছিলুম, কিন্তু নানা গোলমালে আমি নীলার কথা একেবারেই ভুলে গেছ্‌লুম। শুনেছেন বোধ হয়, আমি মাত্র কাল এসেছি। কলকাতায় গিয়ে ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়ে—"

হরিঘোষ বলিলেন, "হ্যাঁ, সব শুনেছি, আপনার চেহারাও বড় খারাপ হয়ে গেছে, স্বাস্থ্য লাভ করতে আপনার এখনও অনেক দেরী। তবু বিরক্ত করতে এসেছি মা, শুধু কন্যাদায়ের জন্যে। এই অগ্রহায়ণে তার বিয়ে দেওয়াই চাই,—না দিতে পারলে আমায় আত্মহত্যা করে এ দায় হতে মুক্ত হতে হবে।"

প্রণতি বিস্ময়ে বলিল, "এমন অবস্থা হয়েছে ?"

বেদনারুদ্ধ কণ্ঠে হরিঘোষ বলিলেন, "আর উপায় কই মা, লোকে যে আমায় সমাজচ্যুত করতে চায়, পরের লাঞ্ছনা, ঘরের লাঞ্ছনা পুরুষ হয়ে আর সহ্য করতে পারা যায় না। কোনক্রমে এক বেলা দুটো ভাতের সংস্থান করতে পারিনে, পড়ণে কাপড় নেই, ব্যারাম হলে ডাক্তার ডাক্‌বার, ওষুধ কিনবার সামর্থ্য নেই,—তবু যেমন করেই হোক—মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। মেয়েটাকে লোকে যা না বলবার তাই বলে, তাকে আর বার হতে দেইনে তবু দেশের লোক যে কোন অছিলায় বাড়ী বয়ে এসে অপমান করে যায়, নির্দ্দোষী মেয়ে আমার নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে,—এতো সইতে পারিনে মা। সে তো নিজে আমার ঘরে আসেনি মা, আমরাই যে তাকে টেনে এনেছি,—এ দোষ যে আমাদের। আমি যদি ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে চলতুম, খেতে পরতে দেওয়ার সামর্থ্য নেই জেনে বিয়ে না করতুম—তা হলে তো এমন হতো না। তাকে আমি বড় ভালবাসি মা এই দরিদ্রের ঘরে জন্মানোর ফলে তাকে যে এমন ভাবে লাঞ্ছিতা হতে হয়, বাপ হয়ে তা যে দেখতে পারিনে মা। এই মাসেই বিয়ে দিতে না পারলে আমি আত্মহত্যা করবো, সেও লাঞ্ছনা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করবে।"

তাঁহার চোখ দুইটী ছল ছল করিতেছিল। প্রণতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বাংলা দেশের বেশীর ভাগ লোক এমনই দরিদ্র, কন্যাদায়ে তাহারা এমনই করিয়া বিব্রত হইয়া পড়ে।

মনের আবেগে বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন, "অনেক কষ্টে একটা পাত্রের জোগাড় করেছি। নায়েব মোহিতমিত্রের ছেলে—তাকে আপনি হয়ত দেখেছেন, তার সঙ্গে এই মাসেই বিয়ে দেওয়ার ঠিক করেছি।"

এই ছেলেটীর কতকটা পরিচয় প্রণতি পাইয়াছিল, সে বিস্ময়ে বলিল, "মোহিতবাবুর ছেলে! শুনেছি সে নাকি এই বয়সেই অধঃপাতে গেছে,—মাতাল চরিত্রহীন,—জেনে শুনে তার হাতে মেয়ে দেবেন?"

বড় ক্ষোভে একটু হাসিয়া হরিঘোষ বলিলেন, "মাতাল চরিত্রহীন বটে, উপায় কই মা? গরীব যারা—তারা সৎচরিত্র ছেলের আশা করতে পারে না, গরীবের মেয়ের ভাগ্যে এমন ধারা পাত্র জুটলে তাই ঢের। গরীব মৃত্যুপথ যাত্রীর হাতে জেনে শুনে মেয়ে অর্পন করে, সতীনের ওপর মেয়ে দেয়, চরিত্রহীনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়। সে ভবিষ্যৎ ভাবতে পারে না, বর্ত্তমানটাই তার কাছে বড় আশঙ্কার।"

প্রণতি চোখ ফিরাইয়া দূর অন্ধকারের উপর রাখিল ঠিক,—তবুও মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে, মেয়ের ভবিষ্যৎ যাই হোক—পিতাকে জাতি রক্ষা করিতেই হইবে। বাঙ্গালায় কয়টি পিতা কন্যার বিবাহের জন্য সৎপাত্র নির্ব্বাচন করেন, কয়টি পিতা দেখিতে চান যাহার হাতে কন্যার্পণ করিবেন তাহার স্বভাব চরিত্র কিরূপ? বাংলার ঘরে ঘরে আজ তরুণী বিধবার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে,—বিধবার দুঃখে অনেকেই কষ্ট অনুভব করেন, কিন্তু কেন যে বিধবার জন্য অনেকেই কষ্ট অনুভব করেন, কিন্তু কেন কে বিধবার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে তাহার পানে কয়জন চাহেন?

নিঃশ্বাস ফেলিয়া প্রণতি বলিল, "আপনার সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়টা খুব বেশী, না ঘোষ মশাই?"

হরিঘোষ শুষ্ক হাসিলেন, বলিলেন, "কে না ভয় করে মা?"

প্রণতি একটু তীক্ষ্ণ সুরেই বলিল, "কিন্তু আমি বলি কি—যে সমাজে এমন কদর্য্য নিয়ম চলে সে সমাজে বাস না করাই ভাল, সকলের কাজ হতে সরে একলা থেকে সে জীবন ভোগ করাও সুখের।"

হরিঘোষ উত্তর দিলেন না, নীরবে কোনদিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রণতি জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়েতে কত খরচ হবে সব সুদ্ধ হিসেব করে বলুন দেখি।"

হরিঘোষ মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন, "তা প্রায় একহাজার পড়বে।"

"সেই ছেলে,—তার সঙ্গে বিয়ে দিতে হাজার টাকা লাগবে ঘোষমশাই—"

প্রণতি বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

হরিঘোষ বলিলেন, "হিরন্ময়বাবুর পত্রখানা পড়ুন, ওতে সব জানতে পারবেন।"

প্রণতি পত্রখানা তুলিয়া লইয়া কাভার ছিড়িয়া ফেলিল।

হিরন্ময়ের হাতে অনেক কাজ থাকায় তিনি আসিতে পারেন নাই, ইহার পর সময় পাইলে তিনি আসিবেন, প্রণতি বলিয়াছিল হরিঘোষের কন্যার বিবাহে সাহায্য করিবে, কোনক্রমে পাঁচশত টাকার যোগাড় সে কি করিয়া দিতে পারিবে না? খুব সম্ভব—সে শরৎবাবুকে একবার বলিলে শরৎবাবু এ টাকাটা দিয়া ফেলিবেন।

মূল কথা এইটুকু, কিন্তু এই টুকুর মধ্যে প্রণতি হিরন্ময়ের একটা নূতন রূপের বিকাশ দেখিতে পাইল। সে শরৎবাবুকে বলিলেই শরৎবাবু পাঁচশত টাকা দিবেন এই কথাটার মধ্যে যে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গোক্তি আছে তা সে হৃদয়ে বেশ অনুভব করিল।

এই মুহূর্ত্তে সে একটা নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তাহাকে উপলক্ষ করিয়া দুইটী অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর মাঝখানে একটা ব্যবধান ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে তাহা সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল।

লজ্জায় প্রণতির মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। ছি ছি, তাহাকে ইহারা ভাবিয়াছে কি? সে তো চায় না তাহার জন্য বন্ধু বিচ্ছেদ হোক, তাহাকে ঘেড়িয়া একটা বিবাদ সূত্র ঘেরিয়া থাকে।

না, সে নিজেই যথাসাধ্য সাহায্য করিবে, হিরন্ময়ের ধার ধারিবে না, শরতের নিকটও যাচ্ঞা

করিবে না। শরৎ তাহার কে, পরের জন্য পরের নিকটে কেন সে যাজ্ঞা করিবে? কথা দিয়াছে সে, কথা শরৎ দেন নাই, তিনি যে তাহার একটী কথায় এতগুলি টাকা দিবেন তাহা হইতে পারে না, ইহা একেবারেই অসম্ভব।

পত্রখানা পার্শ্বস্থিত টেবলের উপর রাখিয়া প্রণতি বলিল, "আমার যতদূর সাধ্য আমি চেষ্টা করব। হিরন্ময় বাবু পাঁচশ টাকা দেওয়ার কথা বলেছেন, অত টাকা যে দিতে পারব তা মনে হয় না। আমার বেতন সামান্য তা বোধ হয় জানেন।"

আগ্রহের সহিত হরিঘোষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিতে পারবেন?"

প্রণতি বলিল, "শ দুই দিতে পারব মনে হচ্ছে।"

হরিঘোষের মলিন চোখ দুইটী উজ্জল হইয়া উঠিল, তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আপনার এই দয়ার জন্যে ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন মা।"

"ভগবান ভাল করবেন—" প্রণতির মুখে একটু হাসির রেখা জাগিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, সে বলিল, "বাকী টাকার উপায় কি করবেন?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হরিঘোষ বলিলেন, "হিরন্ময় বাবুর কাছে বাড়ীখানা বিক্রী করেছি। তাঁর বাড়ীর লাগা বলে তিনি অনেককাল হতে এ বাড়ীটা নেওয়ার চেষ্টা করছেন, আমি কিছুতেই দেইনি— কারণ এ আমায় বাস্তুভিটে। এতকাল পরে এই মেয়েটীর বিয়ে দিতে আমার ভিটে পর্য্যন্ত হারাতে হল।'

বোধ হয় তাঁহার চোখেও জল আসিয়া পড়িয়াছিল তাই তিনি তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

প্রণতি জিজ্ঞাসা করিল, "থাকবেন কোথায়?"

বৃদ্ধ উদাসভাবে উত্তর দিলেন, "হিরন্ময়বাবু মাস চারেক থাকতে দেবেন তারপর কি হবে ভগবান জানেন।"

প্রণতি বলিল, "তারপর ছেলেমেয়েদের খেতে দিবেন কি?"

হরিঘোষ উত্তর দিলেন, "তাদের কপালে যা আছে তাই হবে। শেষে কি হবে সে ভাবনা ভেবে কে কবে কোন কাজ করেছে মা?"

প্রণতি ধীরভাবে বলিল, "কিন্তু শেষের সম্বলও তো লোকে রাখতে চায় ঘোষমশাই?"

হরিঘোষ বিষাদে হাসিয়া বলিলেন, "গরীব সামনের দায়টা ঠেলে উঠতে চায় মা, গরীবের ভবিষ্যৎ ভাবনা থাকে না।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিদায় লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

প্রণতি গুম হইয়া বসিয়া রহিল। বিভিন্ন অনেকগুলি চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে ছুটাছুটি করিতেছিল, কোনটা রাখিয়া কোনটা আগে মীমাংসা করিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

শরতের কথা মনে করিতে সে কতকটা মুসড়িয়া পড়িল।

হিরণ্ময়ের পত্র দেখিয়াই তাঁহার মুখখানার উপর যে কয়টা রেখা জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা প্রণতির চোখ এড়াইতে পারে নাই। তিনি পত্রের ভিতর দেখেন নাই, উপরটা দেখিয়া কি ভাবিয়াছেন কে জানে।

চুলোয় যাক তাঁহার ভাবনা, তাঁহার সিদ্ধান্ত! তিনি জমিদার, স্কুলের সর্ব্বময় কর্ত্তা, প্রণতি স্কুলের টিচার, তাঁহার সহিত প্রণতির সম্পর্ক মাত্র এইটুকু, প্রণতিকে কে পত্র দিল না দিল সে সব বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক তাঁহার কিছুমাত্র নাই।

প্রণতি ভাবিয়া দেখিল কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে শরতের প্রকৃতি যেন খানিকটা বদলাইয়া গিয়াছে। সে কলিকাতা হইতে শরৎকে পত্র দিয়াছিল, শরৎ কোন উত্তর দেন নাই, এমন কি মাণিকের সম্বন্ধেও কোন কথা তাহাকে জানানো আবশ্যকতা মনে করেন নাই।

প্রণতির মনটা ভারি হইয়া উঠিল। সে ঠিক করিল শরতের কাছে কোন কথা বলা হইবে না।

তাহার নিজের দুইশত টাকা পোষ্টঅফিসে আছে, তাহাই তুলিয়া লইয়া সে নীলার বিবাহে দিবে।

নিজের গাম্ভীর্য্য সে রাখিতে পারে নাই, নিজকে সে হালকা করিয়া ফেলিয়াছে এই কথাটাই তাহার মনে বড় আঘাত দিতেছিল। যাহারা নারীর নারীত্বকে সম্মানের চোখে কোনদিন দেখিতে পারে না, তাহাদের সংস্রবে যাওয়া যে কোন নারীর পক্ষে দারুণ অপমান ছাড়া আর কিছুই নহে।

হিরণ্ময় লোকটাই বা কি রকম, তিনিও শিক্ষিত সংযতচিত্ত পুরুষ। শরৎ উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিলেন, কিন্তু হিরণ্ময়ের চরিত্রে কেহ কোনদিন দোষ দিতে পারে নাই। ছিঃ! মানুষের উপর একেবারে ঘৃণা জন্মিয়া গেল যে।

এই সুন্দর জগৎ, ইহারই সৌন্দর্য্য দেখিয়া সে মুগ্ধ হইত, এই জগৎকেই সে বড় ভালবাসিত। জগতের উপরটা দেখিতে সুন্দর বটে, ইহার ভিতর যে ক্লেদ পূর্ণ মানুষের ব্যবহারেই ক্লেদ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিতেছে।

প্রণতি ঠিক করিল কালই সে পোষ্ট অফিসে টাকা তুলিয়া ঠিক করিয়া লইবে। সে সাহায্য করিবে বলিয়াছে, এখন পিছাইলে চলিবে না।

বাপুয়া ডাকিল—"দিদিমনী, রাত অনেক হয়েছে।"

চমকাইয়া উঠিয়া সে দেয়ালের ঘড়ির পানে তাকাইল, দশটা বাজে।

"এখানকার জিনিসগুলো ঘরে তুলে নিয়ে যা বাপুয়া, তুই খেয়ে নে গিয়ে,—আমি আজ কিছু খাব না, বুঝলি শুধু আমার দুধটা দিস—"

বলিয়া প্রণতি উঠিয়া পড়িল।

(২৩)

পোষ্ট অফিস হইতে টাকা তুলা হইল না, প্রণতি অনেক ভাবিয়া নিজের হাতের চুড়ি কয়গাছি বিক্রয় করিবার মতলব করিল।

কিন্তু এখানে কাহার নিকট সে এগুলি বিক্রয় করিবে? একমাত্র শরৎ ও হিরণ্ময় ছাড়া আর কাহাকেও সে বড় একটা চিনে না, কিন্তু ইহাদের কাছে চুড়ি বিক্রয়ার্থে সে বাপুয়াকে পাঠাইতে পারিল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে বাপুয়াকে শ্রীনাথ বাবুর নিকটে পাঠাইয়া দিল।

শ্রীনাথ বাবু সোণা কষিয়া ওজন করিয়া বাপুয়ার হাতে টাকা দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। টাকা পাইবা মাত্র প্রণতি হরিঘোষকে ডাকিতে পাঠাইল, এবং তাঁহাকে সেই টাকাগুলি দিল। টাকা লইয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আশীর্ব্বাদ করিয়া হরিঘোষ ফিরিয়া গেলেন।

ফাঁকা আশীর্ব্বাদ, ইহার কোন মূল্যই নাই। প্রণতি স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল, সবাই এ কথা জানে তথাপি কোনই বা আশীর্ব্বাদ করে, কেনই বা গ্রহণ করে? মুখের একটা ছোট কথা চিরসুখী হও, কিন্তু এ আশীর্ব্বাদ কাহারও ফলিয়াছে কি, কেহ কখনও চিরসুখী হইতে পারিয়াছে কি? কথাটা বলিতে পারে লোকে সহজেই, কিন্তু সে কথা কার্য্যেই ফলে কই?

বিবাহের দিন আসিয়া পড়িল, সনদা নিজে প্রণতিকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। তাহার হাত দুইখানি দুই হাতের মধ্যে লইয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "তোমার এ উপকারের কথা আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব না মা। তুমি আমার যা করলে, এমন উপকার বড় একটা কেউ করতে পারে না। তোমায় বিয়ের দিন সকাল হতে আমার বাড়ীতে থাককেই হবে।"

প্রণতি হাত দুখানা ধীরে ধীরে মুক্ত করিয়া বলিল "আমি তাতে রাজি আছি, কিন্তু আপনার সমাজ রাজি হবে তো?"

বিস্মিতা সনদা বলিলেন, "সমাজ রাজি হবে কি রকম?"

প্রণতি দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল, "আশ্চর্য্য যে সব জেনে

শুনেও বলছেন সমাজ রাজি হবে কি রকম? সমাজ কি বলেনি আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেশী, আর সেই জন্যেই কি সে আশঙ্কা করেনি আপনার মেয়ে খৃষ্টান হয়ে যাবে? সেই জন্যেই কি সমাজ আপনাদের উৎপীড়ন করেনি, আর ঠিক সেই কারণেই কি আপনারা নায়েবের অসৎ চরিত্র,—অকাল কুষ্মাণ্ড ছেলেটার হাতে নীলাকে সমর্পণ করছেন না? এই সমাজের চোখ রাঙানীতে আপনারা ভয়ে কাঁপছেন, বিয়েতে আমি যদি সকাল হতে আপনার বাড়ীতে থাকি আপনার সমাজ তাতে আবার এক কথা তুলে বসবে না তো?—বেশ করে ভেবে কথা বলবেন, শেষ কালটায় যেন আমাকে দোষ দেবেন না।"

"তোমাকে দোষ দেব মা"—সনদা যেন এতটুকু হইয়া গেলেন, ভাবিয়া দেখিলেন প্রণতি যে কথা বলিতেছে তাহা যথার্থ সত্য। একান্ত অসহায়ার মত তিনি বলিলেন, "সেটা আমায় অনর্থক বলা মা, কেন না—"

প্রণতি নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই নারীর উপর এরূপভাবে তীব্র কথার বোঝা চাপাইয়া দেওয়া একেবারেই অনুচিত।

সে বলিল, "আপনি আর কি বলবেন। তবে এই কথা বলছি সমাজ যদি আমার উপস্থিতে দোষ না ধরে, বিয়ের সময় আবার কোন গণ্ডগোল না বাধে তা হলে আমি যেতে পারি।"

অত্যন্ত সঙ্কুচিতা হইয়া সনদা বলিলেন, "কিন্তু তুমি না গেলে কি করে হবে মা?"

প্রণতি একটু হাসিয়া বলিল, "সেটা আপনার মন রাখা কথা মা,—যাক, এ বিষয়ে আপনাকে আর বেশী কথা বলব না। আমি সোজা কথা বলে দিচ্ছি শুনুন,—আমি সন্ধ্যাবেলায় যাব, দূর হতে বিয়ে দেখে তাকে আশীর্ব্বাদ করে চলে আসব।"

সনদা তাহাতেই রাজি হইয়া চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার একটু পরে প্রণতি বিবাহ বাড়ী উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া মেয়েরা একটু সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলেন। অনেকেই চুপি চুপি বলিতেছিলেন, "যত সব অনাচার। এর মধ্যে ইনি আবার এসে জুটলেন কেন,—হাজার হোক—জাতে খৃষ্টান তো বটে,—ছুঁলে যাদের চান করতে হয়। এই যে ছিষ্টি জিনিস পত্তর ছোঁয়া পড়বে, কেউ কি খাবে?" কথাগুলি এমন চুপি চুপি উক্ত হইয়াছিল যে তাহা সহজেই প্রণতির কানে গিয়া পৌছাইয়াছিল। সে একটু হাসিল মাত্র। নিজে যতদূর সম্ভব তফাতে রহিল, বারাণ্ডায় পর্য্যন্ত উঠিল না।

নীলার মুখ খানা অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, প্রণতির সহিত চোখা চোখি হইতেই সে উঠিবার উপক্রম করিতেছিল, প্রণতি ইঙ্গিতে নিষেধ করিল।

সন্ধ্যার খানিক পরে পাত্র আসিয়া সভাস্থ হইল, পাত্রের বয়স অনেক হইয়াছে, প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ উভয়ই বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও সে আবার নীলার পাণিগ্রহণ করিতে আসিয়াছে।

প্রণতি নিস্তব্ধে দেখিতে লাগিল এই সমাজের প্রধান অঙ্গ, প্রধান বন্ধন। বিবাহের উপর সমাজ নির্ভর করে, ইহার মধ্য হইতে সমাজ নবশক্তি লাভ করে, এই লোকটীর সহিত তরুণীটির বিবাহ হইবে ইহাই সর্ব্ববাদী সম্মত মত। এমন ছেলের হাতে কন্যা দান করার চেয়ে তাহাকে আজীবন কুমারী রাখাও যে বাঞ্ছণীয় তাহা দেশের লোক বোঝে না, নারী জন্ম গ্রহণ করিলেই তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে দেশের লোক এক বাক্যে তাহাই বলে। এইরূপ অযোগ্য বিবাহের ফলে দেশের যে কত সর্ব্বনাশ হইতেছে কত নারী বিধবা হইয়াছে, কত রুগ্ন শিশু ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে কে তাহার হিসাব রাখে। সমাজ পুরুষের বয়স দেখে না, স্বাস্থ্য দেখে না, স্বভাব চরিত্র দেখে না; যে কোন বয়স হোক, ভগ্ন স্বাস্থ্যে হোক, হৃতচরিত্র হোক তাহার বিবাহ করিবার অধিকার আছে।

অবগুণ্ঠনাবৃতা নীলাকে বরের পার্শ্বে লইয়া যাওয়া

হইল। দানের জিনিষ, নগদ টাকা সব দেওয়া হইল, কিন্তু এই সময়েই কি গোলমাল বাধিল।

দূরে থাকিয়া প্রণতি কিছু বুঝিতে পারিল না, তাহার কানে শুধু বর কর্ত্তার চীৎকার ভাসিয়া আসিল—"এই রকম জোচ্চরী ভদ্রলোকে করে? আমি কখনই এমন ছোট লোকের মেয়ে নেব না। আরও দুবার এই ছেলের বিয়ে দিয়েছি, কোথাও এমন জোচ্চুরি দেখিনি' আমার ছেলের বিয়ের ভাবনা? দেখে আসুক দুটো বউ আমার ঘরে এখনও বর্ত্তমান, কি তারা এনেছে? ছেলের বিয়ের আবার ভাবনা, একি মেয়ে যে আমার জাত যাবে? এখনি ছেলে উঠিয়ে নিয়ে যাব, কখনো বিয়ে দেব না।"

বৃদ্ধ হরিঘোষ গলায় কাপড় দিয়া সাশ্রুনয়নে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন, ভদ্রলোকেরা অনেক বলিলেন কিন্তু বর কর্ত্তা অচল, অটল; সগর্ব্বে তিনি পুত্র উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

চারিদিকে একটা কোলাহল উঠিয়া মুহূর্ত্তে যেন ঐন্দ্রজালিকের মোহময় যষ্ঠি স্পর্শে একেবারে নীরব হইয়া গেল। কেবল অন্তঃপুরে রোদনের সুর ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

প্রণতি সংবাদ লইয়া জানিল বর কর্ত্তা ছয় শত টাকা চাহিয়াছিলেন, হরিঘোষ কোন ক্রমে পাঁচ শত টাকা যোগাড় করিয়াছিলেন; এক শত টাকা কম হওয়াতেই এই ভীষণ ব্যাপার বাধিয়া গেল।

হরিঘোষ বর কর্ত্তার পা দু'খানা জড়াইয়া ধরিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "এক মাসের কড়ার লিখে দিচ্ছি, এর মধ্যে যেমন করে পারি আপনার টাকা টাকা দেব, এখন বিয়ে বন্ধ করে আমার জাত মান নষ্ট করবেন না।" কিন্তু বর কর্ত্তা তাঁহার কথা কাণে তুলেন নাই।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রণতি বলিল, "গ্রামের এমন লোক এখানে উপস্থিত নেই যিনি এক শত টাকা দিয়ে এ ভদ্রলোককে কন্যাদায় হতে উদ্ধার করতে পারতেন?"

তাহার তীব্র কণ্ঠোচ্চারিত এই কথাগুলি বিবাহ সভাস্থ সকলেরই কাণে গিয়াছিল, কেহ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। হিরন্ময় অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"মিথ্যে দোষ দিচ্ছেন মিস বোস, আমি বললুম, আমি টাকা দেব কিন্তু—"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রণতি বলিল, "দেবেন বলেছিলেন সেটা এই সঙ্গে এনে দিলে এ ভদ্রলোকের জাত মান রক্ষা হতো—এখন এদের উপায়?"

বিষণ্ণ ভাবে হিরণ্ময় উত্তর দিলেন, "উপায় ভগবান।"

বড় দুঃখেও হাসি আসে, তাই প্রণতিও হাসিয়া ফেলিল, তখনই তাহার মুখখানা তেমনই অন্ধকার হইয়া আসিল, সে দৃপ্ত কণ্ঠে বলিল, "যারা কাপুরুষ তারাই সব বোঝা ভগবানের 'পরে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। যারা যথার্থ সাহসী তারা ভগবানকে মনে ভেবে রেখে এগিয়ে যায়, তারা জানে—ভগবান উপলক্ষ্য দিয়ে কাজ করিয়ে নেন। আপনারা কথাটা এমন ভাবে বলছেন যেন ভগবান এই মেয়েটার জন্যে পাত্র এনে একেবারে সামনে ধরবেন আর আপনারা ঝাঁ করে বিয়েটা দিয়ে ফেলবেন।"

হিরণ্ময়ের সুগৌর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "কতকটা ঠিক কথাই বলেছেন মিস বোস, কিন্তু কথা হচ্ছে কি—আমরা অদৃষ্ট বাদী, অদৃষ্ট মানি, কাজেই নির্ভর করে থাকতে হয়।"

প্রণতি বলিল, "অদৃষ্ট মেনে চলতে গেলে মেয়েটার উপায় কি হবে? আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন মেয়েটার অদৃষ্টে ছিল তাই বর বিয়ে করতে এসে ঘুরে গেল। এরপর আপনারা ইচ্ছা করলে কিছু করতে পারেন তা করবেন না একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে আছেন—কেননা অদৃষ্টের পরে মানুষের হাত চলতে পারে না। অদৃষ্ট বাদের 'পরে নির্ভর করে মেয়েটা যদি চিরকুমারী থাকতে চায় তখন আপনারা কেন তা থাকতে দেন না, তার বেলা কেন বলতে

চান অদৃষ্ট আবার কি? মেয়েটীর যদি অদৃষ্টে আছে যে লেখা পড়া শিখে মানুষ হতে চায় আপনারা তা সমাজ গর্হিত বলে জোর করে তার বিয়ে দিতে চান কেন? যখন সমান ভাবে সকল কাজে অদৃষ্ট না মানেন তখন এই সময়টাতেই বা অদৃষ্ট বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লে চলবে কেন? গ্রামে এত ভদ্রলোক রয়েছেন, কেউ কি এই ভদ্রলোকের এই নিদারুণ বিপদে সাহায্য করবেন না?"

তারকবাবু প্রবীণ লোক, তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমরা কি সাহায্য করব বলুন।"

—প্রণতির সমস্ত মুখ খানা বিকৃত হইয়া উঠিল, সে বলিল, "সে কথা কি আমাকেই বলতে হবে, আপনাদের কর্ত্তব্য কি আমাকেই ঠিক করে দিতে হবে? এখানে অনেক কায়স্থ আছেন, বিয়ের উপযুক্ত অনেক ছেলেও এখানে আছে, কেউ কি দয়া করে এই মেয়েটীকে গ্রহণ করে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারবেন না? নিজের পরিচয় দেবার জায়গা এই খানে, মনুষ্যত্ব এই খানেই ফুটে উঠবে, দেশের দশের উপকারে আমাদের ছেলেদের উৎসাহ দেখা যাবে—যদি কেউ এই মেয়েটীকে গ্রহণ করে। এ কলঙ্ক শুধু এই ভদ্রলোকেরই নয়, এ দেশেরও কলঙ্ক। আপনারা যখন এ দেশের অধিবাসী তখন এ কলঙ্ক-তিলক আপনাদের পরতেই হবে। ধর্ম্মের দিকে চেয়ে, অভাগিনী মেয়েটীর পানে চেয়ে—আসুন কে আসবেন, কে এ সময় নিজের মনের পরিচয় দেবেন—এগিয়ে আসুন।"

কিন্তু হায়, কেহ আসিল না। পিছন দিক হইতে সরিতে সরিতে সকলেই সরিয়া পড়িল। দৃপ্তনেত্রে প্রণতি দেখিল—এই বাঙ্গলার সমাজ, এই বাঙ্গালী ইহারাই জাতি নামে পরিচয় দিতে চায়। বাঙ্গালী উন্নত হইতে গিয়া আবার পিছাইয়া পড়িতেছে, তাহার মধ্যে গলদ যে যথেষ্ট। এই বাঙ্গালার পল্লী, ইহারাই পল্লীবাসি, সময় সময় ইহারাই জোর গলায় পল্লী-সংস্কারের প্রস্তাব তুলে। এই সব দেশের ছেলে, পঞ্চ-মুখে ইহারা দেশ সংস্কারের কথা বলে, কাজের বেলা পিছনে সরিতে সরিতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া যায়।

ব্যথিত নেত্রে হিরণ্ময়ের পানে চাহিয়া প্রণতি ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এই আপনার দেশবাসি হিরণ বাবু? কু কথায় কু-আলোচনায় যাদের অন্তর মুখ ভরা, কাজের বেলা যারা সরে দাঁড়ায়, কাউকে সমাজচ্যুত করতে যারা এগিয়ে এসে দাঁড়ায়, এরাই আপনার দেশের লোক, আপনার কুটুম্ব-আত্মীয়-ভাই হিরণ বাবু?"

হিরণ্ময় অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর মুখ তুলিয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "দেশের এ কলঙ্ক হয় তো আমিই ঘুচাতে পারতুম মিস বোস, কিন্তু আমি বিবাহিত—ব্রাহ্মণ—"

প্রণতি উত্তেজনা বশে তাঁহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ব্রাহ্মণ বিবাহিত এ সব কথা বলবেন না হিরণ বাবু। ব্রাহ্মণ যদি তবে প্রকৃত ব্রহ্মণত্বের পরিচয় দিন, কায়স্থ কন্যাকে উদ্ধার করুন আপনার স্ত্রী আপনার এই মহানুভবতা নিশ্চয়ই ক্ষমার চোখে দেখবেন। আরও কি দ্বিধা জাগিয়ে রাখতে চান হিরণবাবু? শিক্ষিত হয়ে, সামনে এই দৃশ্য দেখে—হৃদয় ফেটে গেলেও তবু মনকে এই বলে প্রবোধ দিতে চান—আপনি ব্রাহ্মণ কায়স্থ কন্যাকে বিবাহ করতে পারবেন না? আপনার ব্রহ্মণত্বের খোলস ফেলে দিন, প্রকৃত মানুষ আপনার মধ্যে জেগে উঠুক, এগিয়ে আসুন। যে খানে জাতি ধূলায় লুটিয়ে পড়ছে, যে খানে সকলেই নিজের নিজের নিয়ে ব্যস্ত এই সময়ে জাতির গুরু ব্রাহ্মণ আপনাকে সামনে দাঁড়াতে হবে, আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে এদের সঙ্গে মিশতে হবে। মিথ্যে অহমিকা নিয়ে আপনার তো আজ দূরে থাকা চলে না, আপনি যে গুরু—পুরোহিত, এ দেশের বুকে যখন যে আন্দোলন উঠেছে, যখন যে কোন বিবাদ বিসংবাদ বেঁধেছে, মীমাংসা আপনিই করে দিয়েছেন, ব্রাহ্মণ আজও এ দিনে এর মীমাংসা আপনাকে করতে হবে।"

একটু নীরব থাকিয়া সে আবার বলিল, "আজ কেউ কারও ভালর চিন্তা করে না হিরণ বাবু। আমার প্রতিবাসী,—আমার স্বজাতি, আমার বাড়ীর পাশে অনাহারে মরে যাচ্ছে, আমরা তাকে আমাদের প্রচুর আহার্য্য থেকে একবিন্দু দি'য়ে তার প্রাণরক্ষা করতে উদাসীন হই। আমার স্বজাতি মেয়ের বিয়ে দিতে না পেরে সমাজচ্যুত হয়, আমার ঘরে বিবাহ যোগ্য ছেলে থাকতে আমি তাদের পানে তাকাইনে। এই তো আমাদের সংরক্ষণের ক্ষমতা, এই তো আমাদের ধ্বংসপ্রায় হিন্দুধর্ম্মকে গড়ে তুলবার চেষ্টা, হিরণ বাবু, পূর্ব্ব যুগে অনেক ব্রাহ্মণ এ রকম ক্ষেত্রে পড়ে স্বজাতির বাইরে যে কোন জাতির মেয়েকে সহধর্ম্মিনী করে নিয়েছিলেন, অনেক ক্ষত্রিয় কন্যা ব্রাহ্মণী হতে পেরেছিলেন, আজকের এই যুগে ব্রাহ্মণের সেই বদান্যতা, সেই উদারতা আপনি রক্ষা করুন। আপনার ধর্ম্ম এতে অটুট, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অটুট, এত অল্পে তা যায় না।"

হিরণ্ময় নত মস্তকে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিলেন। হঠাৎ কোন কথা তিনি বলিতে পারিলেন না। তিনি বলিতে পারিলেন না যে ব্রাহ্মণ একদিন দেবতার সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে ব্রাহ্মণ একদিন নিন্দা বা প্রশংসার বাহিরে ছিল—সে ব্রাহ্মণ আজ অন্য সকলেরই সমপর্য্যায়ে দাঁড়াইয়াছে। যে দিন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করিয়াও সগৌরবে ব্রাহ্মণের সম্মান লাভ করিয়াছিলেন সেই দিনকার সে ব্রাহ্মণ আর এ দিনকার এ ব্রাহ্মণে দূরত্ব অনেক খানি, সে ব্রাহ্মণ নিজের সুখের পানে চাহেন নাই, কেবল ধর্ম্মের পানে, দেশের পানে, দশের পানে চাহিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান ছিল পরের মঙ্গল, ইচ্ছা ছিল পরের মঙ্গল, কাজেও তাই পরের মঙ্গল করিত, কিন্তু এ যুগের ব্রাহ্মণ স্বার্থপর সে নিজের ছাড়া পরের দিক দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

ক্রমশ :—

সেতার-আলাপে

শ্রী যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

তার কথাটি সেদিন থেকে মনে আমার বিশেষ ক'রে জাগে!
আজ অবধি সেই রাগিণী মনের তারে দিন যামিনী বাজে!
বাজে ওগো বাজে আমার বুকের মাঝে গভীর অনুরাগে!
মাতিয়ে দিতে মন্-মাতানো সব্-ভুলানো কাজে!
সে-সব কথা কইনি আজো একটা কেমন নীরব-থাকা লাজে!

নয়ন যেমন তেম্‌নি ভুরু, তেম্‌নি সে নাক, তেম্‌নি কচি মুখ !
তার সে সোণার অঙ্গে, মরি, স্বপন্‌-পরী রঙ্গ করে কত !
মস্তকে তার বস্ত্র ছিল, লজ্জাতে ফের্‌ কাঁপ্‌তেছিল বুক !
কোলের উপর সেতার যেন সুখে মূর্চ্ছাহত !
তখন তাকে মানাচ্ছিল সদ্য-ফোটা ফুল্‌-কুমারীর মতো !

মনের পটে যাবজ্জীবন রইলো ও-রূপ আপনা হ'তেই আঁকা !
দেখ্‌লে বাড়ে দেখার নেশা, সেই তো রূপের চরম সার্থকতা !
কল্পচোখে দেখ্‌ছি এখন, সত্যি জানি এ-দেখা নয় ফাঁকা !
এটা আমার মোটেই নহে মনের প্রগল্ভতা !
রূপের মদের মাতাল আমি, হায় গো একি চিত্ত-চঞ্চলতা !

লো কিশোরী, যখন তুমি সেতারখানি বাজাচ্ছিলে বেশ !
নিশাস ফেলার পাইনি সময়, পাছে ঈষৎ শুন্‌তে বাধা পাই !
'পিলু' যেন মূর্ত্তি ধরে 'দাঁড়িয়েছিল জুড়ে' নয়ন্‌-দেশ !
চোখে আমার এক্‌টিবার-ও পলক পড়ে নাই !
রূপে গুণে আকুল হয়ে তখন কেবল দেখ্‌তে তোমায় চাই !

আধেক্‌-ফোটা জীবন তোমার ফুট্‌বে যেদিন, ধন্য হবে প্রাণ !
হৃদয় প্রেমে পূর্ণ রেখো, নাচুক্‌ হিয়া চাঁদের কিরণ পেয়ে !
গন্ধে তোমার ভর্‌বে ভুবন, গাইব সেদিন আকুল্‌-করা গান !
লো রূপসী, হরিণ্‌-আঁখি, ধন্য মায়ের মেয়ে !
এই কবিতা আদর পাবে সারা জীবন তোমার গাথা গেয়ে !

ছন্নছাড়া

শ্রী সুবোধ রায়, বি-এ

চিন্তার আর অন্ত নেই। এই নির্জ্জীব দুর্ব্বল শরীর নিয়ে আর ত' ভাবতে পারি নে সুযোগ পেয়ে মনটাও যেন বিদ্রোহী অবাধ্য হ'য়ে উঠেচে। কতবারই ত' এই সব দুশ্চিন্তাকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা ক'রেচি, একটিকে দূর করতে আরও সহস্র চিন্তা দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর মতো চারদিক থেকে আক্রমণ ক'রেচে।.........কিছুতেই আর পরিত্রাণ নেই।

দিনের আয়ু ফুরিয়ে এসেচে। গোধূলির নিবন্ত আলো সন্ধ্যার আগমনীর সুর ভাঁজ্‌চে। রাত্রের রূপটিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্য আকাশের আজ কী অধীর আগ্রহ!

আকাশ পারের বার্ত্তা ব'য়ে সাঁজের হাওয়া যেন ছুটোছুটি করে। সন্ধ্যা প্রিয়ার সুকোমল করস্পর্শে অনুভব করি, একটি ব্যাকুল সুনিবিড় আলিঙ্গন।......

বাহির যেন বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকে। ডায়েরীতে আজ স্পষ্ট ক'রেই লিখি—পৃথিবীকে আর ভালবাসি না। সহ্যশীলতার একটা সীমা আছে ত? এই শুষ্ক সংসারের এক ঘেঁ'য়ে নিদারুণ নির্য্যাতন আমায় অক্ষম পঙ্গু ক'রে ফেলেচে। এ অত্যাচারের একটা প্রতিবিধান চাই।

আমার এই সীমাহীন মর্ম্মন্তুদ দুঃখে আমার নিজেরই কান্না পায়। কি এ অসহ্য ভীষণ নিরুপায়তা! এই বিবর্ণ বৈচিত্র্যহীন বর্ত্তমানে এমন কোনো অবলম্বন নেই যা'কে আঁক্‌ড়ে ধ'রে মনকে একটুও সান্ত্বনা দিতে পারি?

কিন্তু আশ্চর্য্য একটি ফোঁটা জলও কি চোখ থেকে পড়্‌তে চায়? এই বিরাট দৈন্য আর অভাবের অত্যাচারে সমস্ত প্রাণটা বুঝি শুকিয়ে মরুভূমি হ'য়ে উঠেছে। অশ্রু যে মানুষের কতখানি আন্তরিকতা ও বেদনার পরিচায়ক সে সত্যটুকু আজ যেন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতে পারচি হয় ত' এই জন্যই সান্ত্বনার চোখের এখন আর অসম্মান করতে পারিনে।

আর নয়। প্রতিজ্ঞা ক'রেচি আজ যেমন ক'রে হোক্ পালিয়ে যেতে হবে।...দূর দূরান্তরে যে দিকে দু'চোখ যায়। সঙ্গীহীন উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেরিয়ে পড়্‌বার জন্যই মন আজ ব্যাকুল চঞ্চল হ'য়ে উঠেচে। সান্ত্বনার ঐ পবিত্র সুন্দর দেহখানি আমারই চোখের সামনে অনশনে অত্যাচারে দিন-কে-দিন কুশ্রী বীভৎস হ'য়ে উঠ্‌বে—সে দৃশ্য কল্পনা করতেও ভয় হয়।

কিন্তু তাই ব'লে ওকে এমন নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতেও ত' মন সরে না...সরল প্রাণা সদাহাস্যময়ী নারী হয়ত' এখন নিশ্চিন্ত মনে খুকীটির সঙ্গে খেলা করচে!......না-না, আর এতটুকু দুর্ব্বলতা সমবেদনা প্রকাশ করা নয়। ঘরের মায়া ত্যাগ ক'রে আজই বেরিয়ে পড়্‌তে না পারলে ওর প্রতি হয় ত' আরও বেশী অবিচার করা হবে। ওকে মুক্তি দেবার এই সুন্দর মুহূর্ত্তকে আজ আর ব্যর্থ হ'তে দেব না।

তবু ভয় হয়। সান্ত্বনাকে এতদিন ধ'রে শুধু অনাদর আর তিরস্কার ক'রেচি ব'লে নয়, ভালোবেসে আজ ওকে আদর জানালুম ব'লে।

আর পারি নে। এইটুকু লিখেই হাঁফিয়ে উঠি। ঘাম ঝরে, রোগা শুক্‌নো আঙুলগুলোও হঠাৎ যেন অচল হ'য়ে পড়ে। চলতে চায় না। শিরা বহুল ঝিঁঝি ধরা অবশ হাতখানিকে ঝাঁকানি দিয়ে কর্ম্মঠ করতে চেষ্টা করি।......

একটা পচা পুরোনো দৈনিক কাগজের ওপর বড় বড় অক্ষরে লিখে রাখি......চললুম সান্ত্বনা। দুঃখের অবসান করতে হয় ত' দুঃখ বাড়ালুম। কিন্তু উপায় নেই।......সস্তা পচা কাগজের ওপর লেখাটা চুপসে ধ্যাবড়া হ'য়ে যায়।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটু জিরিয়ে আবার লিখি—খুকীটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা কোরো। আমাদের শেষ সম্বল, ঐ জীর্ণ স্মৃতিটুকুই আমাদের অশুভ মিলনের সাক্ষী থাকুক শুধু। এ জীবনে তোমায় অনেক দুঃখ দিয়ে গেলুম। সে অপরাধের আর প্রায়শ্চিত নেই। আমায় ক্ষমা কোরো। আমি অত্যন্ত হতভাগ্য। বৃথা আমায় খোঁজ ক'রে হয়রাণ হোয়ো না।

অন্ধকার! একটা নিশ্চল নিস্তব্ধতার স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গ ছম ছম ক'রে ওঠে। খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে সান্ত্বনার কাছে যাই। স্যাঁৎসেতে বিশ্রী ঘর। দম্ আঁটকে আসে—এম্‌নি পচা ভ্যাঁপ্‌সানি দুর্গন্ধ। কেরোসিনের কুপিটা নোংরা কুলুঙ্গিটাকে আরও কুশ্রী—কদর্য্য ক'রে তোলে। ঠাণ্ডা মাটীর ওপর শতছিন্ন আঁচলখানি বিছিয়ে প্রায় অনাবৃত আদুল গায়েই ও খুকীকে বুকে নিয়ে ঘুমুচ্ছিল।......আরও একটু এগিয়ে যাই।—যাওয়ার আগে শেষ বারটি একবার প্রাণ ভ'রে ওকে দেখে যেতে চাই।

শ্রাবণের পুঞ্জীভূত নিবিড় মেঘ সম্ভারের মতো কালো কেশ ভার এখানে সেখানে লুটিয়ে দিয়ে কি অপার তৃপ্তিতেই ঘুমুচ্ছে।......সান্ত্বনাই ঠিক। একটি মূর্ত্তিমতী সান্ত্বনা। ও নাম ছাড়া অন্য কোনো নামই বুঝি মানায় না ওকে। সমস্ত মুখখানি ভ'রে একটি যেন অনির্ব্বচনীয় দীপ্তি একটি অপরূপ প্রভা উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেচে। একটুকু মলিনতা বিষাদের ছায়া পর্য্যন্ত নেই। বেদনা ওকে সুন্দর পরম গৌরবময় ক'রে তুলেচে।

ঘুমন্ত অবস্থায় সান্ত্বনাকে বুঝি এত মনোযোগ দিয়ে আর কোনোদিন লক্ষ্য করিনি, নইলে আজ এত বিস্মিত হচ্ছি কেন? নিঃশ্বাস নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভরাট্ বুকের ছন্দময় উত্থান পতনের ভঙ্গীটিও আজ আমার লক্ষ্য এড়ায় না। ভারি মিষ্টি লাগে। লঘু নৃত্যের ছন্দে কি অপরূপ সুন্দর ভঙ্গীতেই বুকখানি কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে!... ..তালে তালে খুকীটিও উঠ্‌চে নাম্‌চে।

উদ্বেলিত উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের বুকে ও যেন একটি ছোট্ট ভেলা ভেসে ভেসে চলেছে।

করুণায়, মমতায় মনটা তরল হ'য়ে আসে। আস্তে, খুব সতর্ককার সঙ্গে মাথার শিয়রে ব'সে ওর পাত্‌লা লেপব ঠোঁট দু'টীর ওপর একটি চুমো দিই। ওর স্বপ্ন-ভারাতুর ঘুমন্ত চোখের পাতার 'পরেও প্রথম একটি তারপর আরও একটি তারপর আরও—খুকীটিকে বুকে করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস পাইনে, যদি জেগে ওঠে সান্ত্বনা।

একটা আজানা আশঙ্কায় সমস্ত শরীরটা শিউরে ওঠে। সান্ত্বনাকে ছেড়ে যেতে বুকের সমস্ত রক্তটুকু জমাট্ বেঁধে হিম হ'য়ে আছে। এই স্বার্থপর হিংস্র পৃথিবীর মাঝখানে কোথাও ত' ওকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে রেখে যেতে পারি নে। এই ভয় ভাবনা পূর্ণ বিপদ সঙ্কুল জীবনের যাত্রা পথে, ও যে নেহাৎ ছেলে-মানুষ একা টিকে থাকতে পারবে কেন?

বুক ভেঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ঝ'রে পড়ে—একটা মর্ম্মভাঙ্গা হাহাকার। ছেঁড়া আঁচলের ভালো অংশটুকু দিয়ে ওর অনাবৃত বুকখানি ভালো ক'রে ঢেকে দিয়ে খুব আস্তে উঠে দাঁড়াই।......আর দেরী করা নয়। এইবার বেরিয়ে পড়তে হবে।

অন্ধকার পথে সুটকেসটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েচি—নিঃসঙ্গ বুভুক্ষু ভিক্ষুক! পথ বুঝি উন্মুখ ব্যগ্রতায় এতক্ষণ আমারই প্রতীক্ষায় হাঁফিয়ে উঠেচে।......

*

* *

বাংলা ছেড়ে অনেক দূরে একেবারে লাহোরে চি। একা নই কিন্তু। এখানেও আছি

আমি আর সেই অপরিহার্য্য দারিদ্র্য আমার চিরপরিচিত অন্তরঙ্গ বন্ধু।

দু'টী ঘণ্টার পরিচয়। কিন্তু লোকটি দেখ্‌ছি আমায় খুব ভালোবেসেই ফেলেচে। ভারী সরল বিশ্বাসী, যা' বলি কিছুই অবিশ্বাস করে না। আগ্রহ নিয়ে শোণে—দরদ দিয়ে বোঝে। আমার দুঃখে সমবেদনা জানায়, অশ্রু-সজল জীবন-কাহিনী শুনে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নিঃসঙ্কোচে কথা বলে যেন কত কালের আলাপী বন্ধু! বিদায় নেবার আগে সস্মিত মুখে অত্যন্ত সরল ভাবে কাঁধে হাত দিয়ে বল্লে—তা হ'লে কথা রইল, কাল একবার যাবেন কিন্তু আমাদের বাড়ী, প্রাইভেট্ টিউটরের খোঁজ নিতে বাবা আজও বল্‌ছিলেন। তা ছাড়া আপ্‌নি ত' ব'সেই আছেন এখন?

একেই বলে সৌভাগ্য! ঠিকানাটা মুখ কর্‌তে কর্‌তে বাড়ী ফিরি। কাল আর কেন আজই যদি বলত!

হাল্‌কা একখানি কালো মেঘের অবগুণ্ঠন তুলে সূর্য্য উঁকি মারে। দেবদারু গাছের মৃদুল কচি পাতায় আলো ঠাঁই পায় না, পিছ্‌লে পড়ে।

নোংরা কাপড় জামা পরে যেতে মনটা আজ আপ্‌না থেকে কেমন বিরূপ বিকৃত হ'য়ে ওঠে। একটা ভালো ইম্‌প্রেসন দেওয়া ত' দরকার। গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারের টাকা দিয়ে যে জামাটি প্রস্তুত ক'রেছিলুম—সুটকেস থেকে মুর্শিদাবাদ সিল্কের সেই পাঞ্জাবিটা বার করি। একটি ফর্সা শান্তিপুরী ধুতিও। আমার বহু আদরের প্রিয় বস্তু। মাসান্তে একদিন ব্যবহার ক'রেই আবার সযত্নে তুলে রাখি।...অবাধ্য বিদ্রোহী চুল গুলোকে অনেক চেষ্টা ক'রেও সায়েস্তা কর্‌তে পারিনে। রুক্ষ চুলের জট ছাড়াতে সস্তা চিরুণীটা ধনুকের মতো বেঁকে যায়। তারপর শেষ শক্তি সঙ্গে সঙ্গেই—

বড় রাস্তার ওপরেই বাড়ী। বাড়ী ত' নয়, রাজপ্রাসাদ তেম্‌নই সুদৃশ্য সুন্দর, রঙ্-বেরঙের ফুলের ছাওয়া প্রকাণ্ড গেটের দুই পাশে দু'টী দ্বার রক্ষক। কাঠের পুতুলের মতো নিস্পন্দ নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে। একটু ব্যস্ততার ভান দেখিয়ে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি—কুমুদবাবু বাড়ী আছেন?

সসম্ভ্রমে নমস্কার ক'রে বিনীত ভাবে বল্লে—আজ্ঞে হাঁ, ডেকে দিচ্ছি একটু অপেক্ষা করুন।

একটু আশ্চর্য্য হই। মনে হয় পোষাকটা বদ্‌লেছি ব'লেই বুঝি এই খাতিরটুকু পেলুম। পোষাকটাই যেন সব। পোষাকের তুলনায় পোষাক-ধারী মানুষের যেন কোনো মূল্যই নেই।

হাস্‌তে হাস্‌তে কুমুদ এসে বলে—কে অনুপ বাবু? যাক্, ভারী খুসী হলুম। মনে ক'রে যে এসেচেন সেও সৌভাগ্য আমার। প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দে হাতখানি ধ'রে একরকম টেনেই বাড়ীর ভেতর নিয়ে যায়। যেতে যেতে বলে—কাল রাত্রেই বাবাকে আপনার সব কথা বলেচি। তিনি রাজী হ'য়েচেন। এখন আপনার কিছু বক্তব্য থাকে, চলুন ঐ বাইরের ঘরেই তিনি আছেন

কুমুদের এই অহেতুক অকচিত অনুগ্রহকে কিন্তু ভারী রহস্যময় অদ্ভুত মনে হয়।

পঁয়ছট্টি বছরের বৃদ্ধ। কিন্তু কি স্বাস্থ্য—নিটোল সুন্দর। খুঁটিনাটি সব কথাই জিজ্ঞাসা করেন। আমার সাংসারিক দুরবস্থার কথা—জন্মাবধি লাঞ্ছনা পাওয়ার কথা—শৈশবেই মা বাপ হারানোর দুরাদৃষ্টের কথা, কিছুই তাঁর আর জান্‌তে বাকী থাকে না। স্বদেশ ছেড়ে এই দূর বিদেশে এসেচি কেন—এম-এ পরীক্ষা দিতেই বা অসমর্থ হলুম কেন তা'রও একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে হয়। অনর্গল প্রশ্ন ক'রে যায়, দিব্যি নিশ্চিন্তে—অক্লেশে। একটু ভাবেও না পর্য্যন্ত। কুমুদের পিতাই ঠিক্।

একটা অননুভূত অপূর্ব আনন্দে প্রাণটা দুলে উঠে। আমার এই সামান্য তুচ্ছ জীবন সম্বন্ধেও যে

রঙীন মোহে আমার ত' আর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে নি……তবে ?

কুমুদের বোন অরুণা কিন্তু ধরেচে ঠিক। এখন বুঝ্তে পার্‌চি অলকার দেওয়া উপহার গ্রহণ করি ব'লেই অরুণা আমায় বিদ্রূপ করে ; সময় মত সাবধান হ'তেও উপদেশ দেয়। নারী চরিত্র বিশ্লেষণ করবার শক্তি পুরুষে না থাক্—নারীর আছে।

অলকাকে আজ স্পষ্টই বল্লুম—আমার প্রতি তোমার এই নিরর্থক পক্ষপাতিত্ব এবং অহেতুক অনুগ্রহের আমি একটা বিপরীত অর্থ গ্রহণ কর্‌বারই অবসর পেয়েচি। আমার এ ধারণা ভুল হোক্ শুধু তাই কামনা করি, কারণ আমায় ভালোবেসে তুমি নিরাশ হবে অলকা, আমি বিবাহিত।……

শুকিয়ে মুখখানি ওর পাংশু হ'য়ে ওঠে। সে যেন অলকার চেহারাই নয়।

আপার গ্রেডে পোষ্টাল ডিপার্টমেণ্টেও একটি চাকুরী পেয়েচি। কুমুদের বাপের কলমের খোঁচা কখনও নাকি ব্যর্থ হয় না। তাঁর অপার অনুগ্রহে কত অনুপসেন যে ছ'বেলা ছ'মুঠো অন্নের সংস্থান ক'রেচে তা'র আর সংখ্যা নেই।

এই তিন মাসে যে টাকা পেয়েচি তা'র অধিকাংশই সান্ত্বনার নামে পাঠিয়েচি। ওর জন্য ভালো ব্লাউস-শাড়ী, খুকীর ফ্রক-জুতাও পাঠাই। নতুন কাপড় পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে উঠ্‌বে হয়ত! পড়্‌শী মেয়েদের কাছে সহজ ভাবে যেতে আজ ওর সঙ্কোচ হবে না নিশ্চয়ই।

* * * *

ষ্টাইল ক'রে বেড়াই। হাট্‌বার তালে তালে বুকের ছাতিটা নাচে। সর্ব্বদাই মনে জাগে আর আমার অভাব নেই। নিঃসম্বল, দুঃখী ভিখারী নই আমি।……পার্কের ভেতর খুব আল্‌গা পা ফেলে ফেলে অরুণা ও টুনির সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা করি।……আচমকা পিঠের ওপর কার কোমল হাতের মৃদু পরশ পেয়ে চম্‌কে দাঁড়াই। বিপুল বিস্ময়ে স্তব্ধ বিহ্বল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করি—কে স্মৃতি? —তুমি—তুমি এখানে?

একই প্রশ্ন সে-ও ক'রে, একই সময়ে—একই সুরে।

ওর স্নিগ্ধোজ্জ্বল কালো দু'টী চোখে একটি অবর্ণনীয় খুসী শিউরে কেঁপে ওঠে।

হাসির রঙে ঠোঁট দু'খানি ছুপিয়ে নিয়ে বলে—দেখ, আমি তোমায় অনেক দূর থেকে দেখেই চিন্‌তে পেরেছিলুম।

ওর চাহনিতে আর ভঙ্গিমায় এমন একটা বিশিষ্টতার ছাপ আছে, যা দেখ্‌লেই ভালো লাগে।

হাতখানি ধ'রে একটু ঝাঁকানি দিয়ে বলি—তোমার এ দুর্লভ শক্তিকে আমি ত' কোনোদিন অস্বীকার করিনি স্মৃতি। বুকের ভেতর আরও অনেক কথা জমা হ'য়ে ওঠে। গুছিয়ে বল্‌তে পারিনে।

স্মৃতিও উস্‌খুস্ করে। কয়েকটি কথা ব'লেও যেন নিজেকে নিঃশেষ শূন্য কর্‌তে চায়।…নির্নিমেষে চেয়ে থাকে। শুধু একটি মুহূর্ত্তের জন্য যেন আমায় একা পেতে চায়। অরুণা ও টুনুর সাম্‌নে আমার সঙ্গে সহজ ভাবে কথা বল্‌তে ও যেন একটু সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ে। একটা দুর্দ্দমনীয় কুণ্ঠা ওর কণ্ঠ চেপে ধ'রে।

কথা হারিয়ে সান্ত্বনার কুশল খবরটাই নিতে চায়। উত্তর দিই—ভালই আছে সে, একদম নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায়। আজ পর্য্যন্ত একখানি চিঠিরও উত্তর পাইনি কিন্তু।

সঙ্গের ভদ্রলোকটি কোন এক অজানা কারণে হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুত হ'য়ে স্মৃতিকে এক রকম ছিনিয়েই নিয়ে যায়। ব্যবহারে ব্যগ্রতার চাইতে বিরক্তিই প্রকাশ পায় বেশী।……যেতে যেতে স্তব্ধ ব্যথিত দৃষ্টি তুলে স্মৃতি বলে—চল্‌লুম অনুপবাবু, এখানে বোধ হয় আর আপ্‌নার সঙ্গে দেখা হবে না। আমরা আজ্‌কেই—

শেষের কথাটা শোনা না গেলেও বোঝা যায়। কণ্ঠস্বরে একটা শান্ত ব্যাকুলতা, একটা গভীর নৈরাশ্যের বেদনা বেজে ওঠে। অস্পষ্ট কিন্তু অতল স্পর্শী।......মর্ম্মাহতা মমতাময়ী নারী, ওর জন্যও একদিন চোখের জল ফেলেছিলুম।

বাসন্তী পূর্ণিমার রাত্রি!

আকাশে আজ জ্যোৎস্নার সমুদ্রে জোয়ার চলেচে। একান্ত নিভৃতে নির্জ্জনে বসে ভাবচি। মনটা ভারি উচ্চকিত উৎসুক হ'য়ে উঠেচে। ...আজ সাতটি মাস সান্ত্বনাকে দেখিনি, কিন্তু মনে হচ্চে সে সাতটি যুগ।

আকাশের অনন্ত সীমা হীনতার মাঝখানে ঐ গর্ব্বোজ্জ্বল সুন্দরী শ্রীময়ী তারাটির পানে চেয়ে আছি। ঐ অতৃপ্ত অকুণ্ঠিত দৃষ্টির সঙ্গে অলকার যেন কোথায় সাদৃশ্য আছে। ......বেশীক্ষণ চাইতে পারিনে, চোখ দুটী ম্লানিয়ে আসে। অলকার চোখ দু'টী বুঝি সান্ত্বনার চাইতেও সুন্দর! ইস্! তাই আর নয়?

এই অফুরন্ত আলো আনন্দের মাঝখানেও আকাশকে ভারী গরীব অসহায় মনে হয়। শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা ও যেন সংসার বিতৃষ্ণা বৈরাগী সন্ন্যাসিনী! কি করুণ বেদনা গভীর দৃষ্টি! মনটা আবার দুলে ওঠে। সান্ত্বনাকে আজ এক মুহূর্ত্তও বুঝি না ভেবে থাকা যায় না। ওকে কাছে নিতে আজ্কের মতো এমন উদ্বেগ ব্যাকুলতা আর কোনোদিন প্রাণে জেগেচে কি না সন্দেহ।......অথচ এই সান্ত্বনাকেই কতদিন অভুক্ত অবস্থায় তীব্র তিরস্কার করেচি। অকারণে তুচ্ছ কথা নিয়ে নিদারুণ ভাবে ওর মর্ম্মে আঘাত দিয়েচি। ......আশ্চর্য্য! একদিনও মুখ গোমরা ক'রে সংসারের কোনও কাজে বিরক্তি বা অনিচ্ছা প্রকাশ করেনি, কেঁদেচে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার অত্যন্ত স্বাভাবিক সহজ সুরেই কথা বলেচে।

আজ আমার সে হৃদয় হীনতা নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ ক'রে বুকখানি কান্নায় ভ'রে ওঠে। অনুশোচনার তীব্র কশাঘাতে প্রাণটা ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে যায়। একদিনও ওকে ভালোবেসে আদর করতে পারলুম না, এর চেয়ে ভয়ানক দুঃখ মর্ম্মান্তিক অনুতাপ আর আমার কি হ'তে পারে!

তিন সপ্তাহের ছুটী অতি অক্লেশেই মঞ্জুর হয়। কেউ আপত্তি করে না। প্রাইভেট্ টিউটর ত' নই যেন কুমুদেরই সহোদর ভাই। ......সান্ত্বনাকে সঙ্গে ক'রে আন্তে বৃদ্ধ আমায় গোপনে পরামর্শ দেয়।

বলে—আহা একরত্তি কচি মেয়ে, ওকে আর এক্লাটি বিদেশে ফেলে রাখা কেন বাপু! সকলে এক সঙ্গে এখানে থাক্‌ব সেই ত' ভালো। আমার কথা শোনো বাবা, ওকে তোমার আন্‌তেই হবে।—দু'টী চোখে তাঁর সে কি অম্লান অকুণ্ঠিত সহানুভূতি! কণ্ঠস্বর যেন দরদে উছ্‌লে পড়ে।

বিদায় নেওয়ার সময় অরুণার চিরপ্রফুল্ল মুখখানি মেঘ্লা দিনের ধোঁয়াটে আকাশের মতোই হঠাৎ ম্লান কালো হ'য়ে আসে। চোখ দু'টী ছলছল করে।

টুনিও কোত্থেকে ছুটে আসে যেন। দিদির পিঠের উপর ঝুঁকে প'ড়ে তা'র কাঁধের ওপর স্নেহার্দ্র ব্যথিত মুখ রেখে বলে—বৌদি মণিকে কিন্তু আনা চাই মাষ্টারমশাই। নইলে ভালো হবে না বল্‌চি। আর দেখুন গিয়েই চিঠি দেবেন।—দেবেন ত? না দিলে কিন্তু আড়ি—আড়ি—আড়ি।

অনেক দূর গিয়ে ফিরে তাকাই একবার। অরুণার ব্যথাতুর সস্নেহ দৃষ্টি তখনও আমার প্রতি পদক্ষেপটিকে আকুল হ'য়ে অনুসরণ করে। অস্পষ্ট দু'টী নারী মূর্ত্তি সুদূর সান্ত্বনার মতোই মধুর—তৃপ্তিকর। অশ্রুমতী দয়ার্দ্রহৃদয়া দু'টী কল্যাণী বোন—বাঙ্‌লা মা'র দরদের প্রতিচ্ছবি—মমতার ফুল।

ইষ্টিশানে পৌঁছে দেখি ট্রেণ ছাড়্‌তে তখনও প্রায় পঁচিশ মিনিট দেরী। ওয়েটিং রুমে ঢুকে সটাং ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ি। নিজেকে কেন জানি আর খুব দুঃখী মনে হয় না। এই নিঃস্ব নিঃসম্বল

প্রাণ কোন্ অরুণ আলোর সোণার কাঠির স্পর্শে হঠাৎ যেন সুশ্রী সুষমাময় হ'য়ে উঠেচে। বিগত দিনের সেই দুঃখ অশান্তিময় মর্ম্মান্তিক বেদনার সঙ্গে এই গৌরবময় সুগোপন সুন্দর আনন্দের তুলনা ক'রে একটি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি পাই। এই অপার খুশী ভরা নদী স্রোতের মতো সহজ স্বচ্ছন্দ প্রাণ নিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তকেই আজ সাদর অভ্যর্থনা করতে ইচ্ছা করে।......ভাবি আমাদের সত্যিকার মিলনের শুভ মুহূর্ত্তগুলো দৈন্যের একটি কালো যবনিকার অন্তরালে এতদিন যেন অস্পষ্ট অদৃশ্য হ'য়েছিল। অন্ধকারের সমস্ত গোপনতা আজ যেন আলোর আভাস পেয়ে হঠাৎ দীপ্ত মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেচে।

আর একটি দিন পরেই সান্ত্বনাকে দেখ্‌তে পাব; একথা ভেবে আনন্দের যেন আর অন্ত পাইনে। আর একটি দিন, একটি দিন পরেই—কি অগাধ তৃপ্তি কি অপার সান্ত্বনা!......অসম্ভাবিতের মতো হঠাৎ আমায় দেখে প্রথম হয় ত' ভারী আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবে। আগের মতো সহজ ভাবে কাছে আস্‌তে উদ্দাম লজ্জায় হয় ত' পা দু'খানি জড়িয়ে যাবে—বুকখানি হয় ত' আনন্দের প্রাচুর্য্যে থর থর করে কেঁপে উঠ্‌বে। উচ্ছ্বসিত খুসীর তরল আবেশের মধ্যে হয় ত' অনেকক্ষণ কোনো কথাই বল্‌তে পার্‌বে না। সঙ্কোচ একটু হবেই ত', কতদিন দেখেনি!

একটি শুভদিন আসেই জীবনে। আমার এই প্রশস্ত প্রশান্ত অন্তরের প্রচুর আবেগ নিয়ে—পরিপূর্ণ দরদ ঢেলে কাল ওকে নূতন ক'রে ভালোবাস্‌তে হবে। এই রকম অকস্মাৎ অনুরাগ আদর জানানো আমার স্বভাবের সঙ্গে হয় ত' একটু অস্বাভাবিক।

বাস্ থেকে নেমেই উদ্ভ্রান্তের মতো লক্ষ্যহীন উদ্দাম তায় হেঁটে চলেচে। প্রায় ছুটেই। পথ যেন ফুরোয় না আর। উৎসুক ব্যগ্রতায় হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ী পৌঁছে দেখি দরজা বন্ধ। মর্চে পড়া ভারী একটা লোহার তালা ঝোলে শুধু। খড়ি দিয়ে দরজার ওপর দুর্ব্বোধ্য বাঁকা অক্ষরে লেখা আছে—ভাড়া দেওয়া যাইবে।

বিস্ময়ে স্তব্ধ নিস্পন্দ হ'য়ে রইলুম। বাড়ী ভুল করি নি ত? কই না?—ঐ ত' সুমুখে সেই বৃহৎ সুরম্য অট্টালিকা, চারু নাপ্‌তের জীর্ণ কুঁড়েখানিও ত' তারই পাশে আজও তেম্নি অসহায় দৃষ্টি মেলে নিতান্ত অপরাধীর মতোই দাঁড়িয়ে আছে। উর্ব্বশী থিয়েটার পার্টির রিহার্শালও চ'লেচে দেখ্‌চি। ঐ ত' সুখেনের কণ্ঠস্বর! . তবে?...

হাসি তামাসার মত হ'য়ে কাছেই কারা যেন খুব রসাল গোপন বিষয়ের আলোচনা করছিল।

উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় একান্ত আকুল হ'য়ে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা এই বাড়ীতে আজ দু' বছর প'রে যে ভাড়াটে ছিল, তাদের খবর কেউ জানো তোমরা?

খুব হাসির কথা যেন। শুনে মেয়েগুলো হেসেই বাঁচে না। এ ওর গায়ে ঢ'লে পড়ে। মুখে কাপড় ঠাসে আর হাসে।

রসিকা সকলেই নয়। সঙ্গিনীদের বেয়াদবিকে শাসন ক'রে গোলাপী সেমিজ আর ডুবে শাড়ী পরা মেয়েটি কি একটু ভেবে নিয়ে ভদ্র ভাবে স'রে এসে নম্র কণ্ঠে বলে—জানি বাবু। আপ্‌নি সেই ছোক্‌রা বাবুটির কথা শুধুচ্ছেন ত? সেই যে বেআক্কেলে বৌ ফেলে লম্বা দিয়েচে? ছ্যাঃ, কি আক্কেল বলুন দিকি? ভদ্রলোকের কি এই উচিৎ কাজ?... হাবাতে-মুরুখুটার এক কড়া রোজগার ছিল না আবার তাই কি দাপট? সে চোকে না দেখ্‌লে পেত্যয় হয় না। নিরীহ বৌটিকে যা' নয় তাই ব'লে রোজ অপমান কর্‌ত। তারপর কি একটা সামান্য কারণে হঠাৎ একদিন মার পিঠ করে নিজেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল—দুঃখু সাম্‌লাতে না পেরে পরের দিন মেয়েটিও যে সেই এক কাপড়েই কচিটিকে বুকে নিয়ে কখন বেরুল আর ফেরেনি। পাড়াময় কি সে হুলুস্থুল কাণ্ড! তখ্‌খুনি পুলিশে খবর দিয়ে কত সন্ধান কর্‌লে ঐ সুখেন বাবুরা। আজও পাত্তা মেলেনি।

ভুরুতে কালি আর গালে খড়ি মাখা মেয়েটি সঙ্গিনীকে একটি ঠেলা মেরে গা দুলিয়ে ঠোঁট উলটিয়ে

বলে—তা' ঢ্যাখ্ ভাই ঢং জিনিসটা আমি দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারিনে। মেয়েটি যেদিন ঘর ছেড়ে বেরোয়, আমি সেদিন রাতে তোর কাছেই আস্‌ছিলুম্ —ঐ গ্যাস বাতির তলে দেখা। কত ক'রে বল্লুম— ওমা তোমার আবার ভাবনা কি গা? অমোন দিব্যি রূপ—এক গা বয়েস! যে দেখ্‌বে একদম লুফে নেবে। তারপর ঝোক দিয়ে মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে এক রকম বিশেষ ভঙ্গী ক'রে আবার বলে— তা' ভাই আমাদের কথা ত' পেথমে পেত্যয় হবেই না। ঘুঘু দেকেচ ফাঁদ ত' আর দেখনি কখনো। কতই ভড়ং কর সতী গিরির ড্যামাক্ কি আর টিক্‌বে এখানে? হুঁ—হুঁ—ঐ ক'লকাতা শহর বাবা যে সে জায়গা নয়।

কানের কাছে মুখ নিয়ে আবার ফিস্ ফিস্ করে বলে—কত মিষ্টি কতায় ভোলালুম মাইরি। ছুঁড়িকে রাখ্‌তে পার্‌লে আজ আর পয়সার অভাব! ঐ পান্না সিং মেড়োকে ত' আগে গোলাম ক'রে রাখ্‌তুম। ব্যাটা সেদিন আঙ্গুর কে মুখের ওপর বলে কি না—

পান্নাসিং আঙ্গুরকে মুখের ওপর কি ব'লেছিল তা' শোনবার মতো মনের অবস্থা তখন ছিল না। চোখের সাম্‌নে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ক্রমাগত ঘুর্‌পাক খাচ্ছিল।...সান্ত্বনা নেই?...আমার সান্ত্বনা। বেদনা বিধুরা ধৈর্য্যশীলা প্রেমময়ী প্রিয়া আমার।......

একটা দুর্ব্বিসহ বেদনায় দুর্দ্দমনীয় শোকাবেগে সমস্ত শরীরটা নিঝুম অবশ হ'য়ে আস্‌ছিল। বুকের ওপর কে যেন নিদারুন নির্ম্মমতায় অবিশ্রান্ত হাতুরীর ঘা হেনে চলেচে।

একান্ত বিহ্বল বিমূঢ়ের মতো শূন্য দৃষ্টি তুলে একবার ভাঙ্গা জান্‌লাটির পানে চাইলুম কতদিন ঐ জান্‌লার ধারে ব'সে কি উৎসুক আগ্রহেই সান্ত্বনা আমার আগমন প্রতীক্ষা ক'রেচে!

এক মুহূর্ত্তেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিই। অস্থির চঞ্চলতায় হৃৎপিণ্ডটা সচল এঞ্জিনের পিষ্টনের মতোই দাপাদাপি সুরু করে। সমস্ত বুকখানি ভ'রে একটা বিরাট শূন্যতা হাহাকার ক'রে ওঠে।......দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হ'য়ে উন্মত্তের মতো অশান্ত উদ্দাম গতিতে আবার সেই পথেই হেঁটে চলেচি—গৃহহারা ছন্নছাড়া পথিক।

অপেক্ষায়

শ্রী গিরিজাকুমার বসু

বিদায়ের দিনে স্মরিওনা আর
স্খলন ত্রুটি
শুধু মুখপানে চাহ মোর, মেলি
নয়ন দুটি
জেনে চ'লে যাবো নহি আমি আর
সে অপরাধী
বিরহের দুখে রব কোনোমতে
হৃদয় বাঁধি

মিলন মোদের হোলোনা যে শুভে
কে তাহে দোষী?
কাহার মাথায় হানিব খড়্গ
বিচারে ব'সি?
প্রণয়ের ডোর ছিঁড়ে থাকে যদি
গঞ্জি' কারে?
নিয়তির এই অভিশাপ, আর
কাহারো নারে।

পরাজয়ে আজ ক্ষোভ নাই কিছু
লো মনোরমা
পাষাণের ভার গেল' বুক হ'তে
করিলে ক্ষমা।
বিফল না হয় হোয়েছে সাধনা
যায়নি আশা
নূতন করিয়া খেলা করি সুরু
ফেলিব পাশা।

কে যেন আমারে যায় ব'লে 'ওরে
হইবি জয়ী
প্রসন্ন তোর স্তবে হবে জানি
করুণাময়ী'
চলিয়াছি পথ সে অভয় স্বরে
হরষে ভাসি'
দেখি কবে দেবী দেখা দেন তাঁর
সেবকে আসি

অতৃপ্ত

শ্রী পাঁচুগোপাল মিত্র

১

নিত্য-নিয়ত রুগী আর মড়া ঘেঁটেই চলি।···

আর্ত্তের কান্না, পীড়িতের কাৎরাণি, মুমূর্ষুর কাতরতা প্রত্যহই শুনে শুনে কেমন যেন আলাদা জীব হ'য়ে গেছি আমরা। বাহিরের জগৎ থেকে যেন কতদূরে।

প্রত্যহকার মত একই ভাবে সেবা করা, ঔষধ দেওয়া রোগীর মুখ বিকৃতি, কটুকথা, হাহাকার শুনে চলা···

মৃত্যুর সাথে প্রত্যহ দেখা-সাক্ষাৎ···

হাতে ক'রে বুড়ো, ছেলে, যুবো সকল নরনারী-কেই যমের কোলে তুলে দেওয়া।

এই আমাদের জীবন···এই আমাদের কাজের ধারা। একঘেয়ে···বড় একঘেয়ে।

নার্সের জীবন···

এই হাসপাতাল, রোগী, করিডোর নিয়েই কেটে যায়। সংসারের কল-কোলাহল, হাসি-গান, ছেলে-মেয়ের ঝামেলা-ঝক্কি কোন কিছুই পেতে পাই না।

সংসার থাক্‌লেও তাকে ছেঁটে রাখতে হয়······

···যদিও যমের সাথে মিতালী আমাদের, যম ডাকে যাকে যতন ক'রে তাকে সাজিয়ে পাঠাই যদিও, তবু মাঝে মাঝে বুকে ঘা লাগে।···

রোজ দেখে দেখে স'য়ে-যাওয়া পাষাণ প্রাণেও ব্যথা বাজে।

তরুণ-তাজা দেহগুলি,·· যখন দেখি অপূর্ণ কামনা বাসনা নিয়েই বিদায় নিয়ে চলেচে দুনিয়া থেকে··· অজ্ঞাতে ঝরে দীর্ঘশ্বাস।

মিলিয়ে যায় বায়ুস্তরে, একরাশি ভাবনা বুকে জাগিয়ে দিয়ে। ভাবি, হায়রে মানুষ! এই তোর গর্ব্ব, অহঙ্কার সকল শেষ।

এই তুইই হয়ত দুদিন আগে ভেবে চ'লেছিলি সুখের কত সোণার স্বপ্ন, কুহকী যৌবন তোর বুনে-ছিল কত রংদার মায়াজাল······

কত প্রেম, ভালবাসা দিয়ে ছিল ভরপুর অন্তরটী তোর···আর আজ!

শেষ সব।

কোথায় রইল প'ড়ে কল্প-লোক, কোথায় বা তোর পরাণের প্রিয়জন আর কোথায় বা গেলি তুই আজ?···

২

কত রাত কেটে যায় মড়া সাম্নে ক'রে। একটা, দুটো নয়···চার, পাঁচ, ছয়···

যখন যেমন।

নিস্তব্ধ, নিশুতি ওয়ার্ড। বাইরের বাতাস বয়··· গহন-রাতির বুকে শব্দ বাজে।

গাছগুলো কাঁপে—সর্ সর্ সির্ সির্, পাতাতে গান গায়—স্বন্ স্বন্ স্বনন্। ওয়ার্ডের ভেতর একা একা ঘুরে বেড়াই।

চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে কোমর আর সোজা থাকতে চায় না। দেহের প্রতি অবয়ব চায় বিশ্রাম।

···পাশের ওয়ার্ডে চ'লে যাই, গিয়ে দেখি সেথাকার নার্স হয়ত ঘুমুচ্ছে।—হাতের চেটোয় মাথাটা গুঁজে···। ঘুম-ভাঙ্গাতে মন চায়না··· আহা ঘুমুক! আমার মত সুখ, দুঃখ তো সবার আছে।

হঠাৎ বুকখানাকে চমকিয়ে দিয়ে একটা চেঁচানী কাণে আসে। ছুটে ফিরি নিজের ওয়ার্ডে।

স্বপন দেখে ভয় পেয়েচে—সে বীভৎস দৃশ্য······ কত ক'রে থামিয়ে দি'। আবার চুপ-চাপ······

মড়া গুলোর দিকে নজর পড়ে—বিকৃত চেহারা সব। কারুর চোখ উল্টানো, কারুর জিব বেরিয়ে পড়েছে, হাওয়ায় কারুর হাতটা ন'ড়চে। মনে হয়, যেন ডাক্‌চে, আয় আয় আয় না লো!

গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, শিউরে উঠি। জোর ক'রে মন ঘুরিয়ে নিই।··

নভেল পড়তে যাই, কিন্তু মন বসে না। এলো মেলো চিন্তা রাশি মনের মাঝে ভেসে বেড়ায়, ভরা যৌবন···রাত্‌ দুপুর, দ্বাদশীর চাঁদ, · জোচ্‌ছনা পোরা ···উন্মুখ সকল চিত্ত বৃত্তি···অস্থির করে; উস্‌খুস্‌ করি।

নিজের হাতেই বুক টিপি······

···ডাক্তার বাবু আসেন। Enquiryতে, কেউ ঘুমুচ্ছে, না কি ক'রচে তা দেখতেও।···

খানিকক্ষণ গল্প করি হ'লেই বা বাজে ··ছাড়তে মন চায় না। মনের এ অবস্থায় মনের মত সাথী পেলে ছাড়তে কি ইচ্ছে হয় গা?

ডাক্তার বাবু বলেন, যাই—

বলি, একা ছেড়ে যেতে কষ্ট হয় না? রহস্য ভরা সুরেই অবশ্য।

হেসে বলেন, এখনো যে আরও বাকী রয়েচে।

বলি, আচ্ছা আচ্ছা যান্‌। অভিমানের মত একটা ভঙ্গী যেন ফুটে বেরোয়। বল্লেন, অবুঝ কেন তুমি! সব্‌কে তো দেখতে হবে।

তারপর কতকগুলো উপদেশ ঝাড়েন। তখন কি ঐ সব ভাল লাগে?·········

৩

রোজ্‌কার জীবনের ধারা এই রকম।

এই একই ভাবে কাটিয়ে যাই।···তবে নেহাতই বৈচিত্র-বিহীন নয় একেবারে।

এই করিডোরের মধ্যেই কত কি দেখ্‌তে পাই। রোগীকে যেমন তার প্রেমিকার ব্যথায় কাঁদ্‌তে দেখেচি। আবার নার্সকেও রোগীর মরণ বা dischargeএ কাঁদ্‌তে দেখেচি।···

একটা ঘটনা বেশ মনে আছে এমনি উজ্জ্বল থাক্‌বেও ··আঃ কি ভালটাই বাস্‌ত সে! বেচারা··· ম'রে গেল। ম'রে যাওয়াটাই কিন্তু তার ভাল হয়েছিল বেঁচে থাক্‌লে পাগল হ'য়ে যেত।···

অতৃপ্ত সাধ, আশা, আকাঙ্খা······

·· ভাবি তাই প্রেম এত অন্ধ ক'রে দেয়।··· বোধ-শক্তিকেও একেবারে লুপ্ত ক'রে তোলে!

আঠারো, উনিশ বয়েস্‌,- ইলা তার নাম।

আমাদের ওয়ার্ডে যখন ভর্ত্তি হ'ল প্যারালিসিসে সর্ব্বশরীর অক্ষম হ'য়ে গেছে। বেশী ক'রে কোমর হ'তে পা পর্য্যন্ত।

তার একটা sweet-heart ছিল, ইন্দ্রজিৎ নামে।

ভর্ত্তি হওয়ার দিন থেকেই ইলা সবাইকে ব'ল্‌ত,—আমাদের যা'কে যখন পেত, আমার চিঠি এসেচে? চিঠি? ইলা দাসের নামে?

না,—শুনেই মুখখানা তার কালো হ'য়ে আস্‌ত, মেঘ ভরা শ্রাবণ আকাশের মত।...চোখ্‌ জলে ভ'রে গিয়ে থম্‌থমে হ'য়ে থাক্‌ত। কিন্তু যেন শরতের আকাশ!

খানিক পরেই বিজলীর চেয়েও পরিষ্কার হাসি হেসে ব'ল্‌ত, আস্‌বে... ..আস্‌বে ঠিক্‌। আপনারা ভাই যত্ন ক'রে নিয়ে নেবেন। পিয়ন যেন ভুল ক'রে না ফেলে দেয়। একটু ব'লে দেবেন। লক্ষ্মী দিদিরা।

ক্রিশ্চিয়ানা ব'ল্‌ত, সে তোমার কার চিঠি ভাই?

সলজ্জ কিন্তু তৃপ্তির হাসি হেসে ইলা ব'ল্‌ত, তার জন্যেই তো ভাই বাঁচ্‌বার আমার এত চেষ্টা। আমি না ভাল হ'লে হয়ত সে......

চোখ দুটী ওমনি করুণ হ'য়ে আস্‌ত।

সান্ত্বনা দিয়ে ব'ল্‌তুম, তুমি ভাল হ'য়ে উঠ্‌লে ব'লে এই ডাক্তার বাবুই ব'ল্‌ছিলেন।

ফিক্ ক'রে হেসে ইলা ব'লত, সত্যি দিদি? আহা সে কবে না জানি! দেখ ভাই আমি তাকে বড্ড ভালবাসি। সেও খুব বাসে।......আমাদের বিয়ে তো হ'ত ভাই; সবই ঠিক্। হঠাৎ আমার এই পোড়া অসুখ হ'য়ে গেল; তাতেই ত......

তা সে আমায় চিঠি দেবে নিশ্চয়ই। কক্ষনো না দিয়ে থাক্‌তে পারবে না। আচ্ছা ভাই আমার চেহারা কি একদম খারাপ হ'য়ে গেছে?

ব'ল্‌তুম, না,—না......

ব'লত—আর তা হ'লেই বা। ভালবাসা কি আর চেহারার ওপর হয়? ভালবাসা প্রাণে, ভালবাসা মনে।......

তার সেই সব কথাগুলো বেশ মনে রয়েচে আমার, সে আমায় ভুলতে পারবে না।......

হারে অভাগী! তুই ভেবে ম'রচিস্ এত, কিন্তু যার জন্য ভাবচিস্ সে কি তোর কথা ভাব্‌চে একটী বার? পুরুষের ভালবাসা তো দেহখানার 'পরেই। দেহের সোয়াদ গেল তো বাস্...তাদেরও ভালবাসার শেষ হ'য়ে গেল। তোর এই বিকৃত, পঙ্গু দেহ কি আজ তাকে টান্‌তে পারবে?......সে হয়ত এতদিন আর কারুর পিছে পিছে ঘুরচে।

আগ্নেস্ ফস্ ক'রে ব'লে ফেল্‌লে, তা তোমার Sweet-heart টী তোমার দেখ্‌তে আসেনা কেন? ইলার মুখ আবার করুণ হ'য়ে গেল। ব'ল্‌লে, কি জানি ভাই!......

চোখ্ দিয়ে আগ্নেস্‌কে ধমকিয়ে দিলুম। তারপর ব'ল্‌লুম, পুরুষ, বেটা-ছেলে সময় পায় না। আমাদের মত তো আর নয়।...

ইলার আবার হাসি ফিরে এল, ব'ল্‌লে—ঠিক ব'লেছ দিদি। কিন্তু চিঠি ঠিক আস্‌বে।

মনের ভাবকে চেপে রেখে ব'ল্‌লুম, হ্যাঁ আস্‌বে বই কি।

৪

ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই।—

ইলার রোগ তো সারলই না, আরও চোখ্‌টা একটু আল্‌গা হ'য়ে এল।

এতদিন চিঠি না পেয়ে তারও মনে চিন্তা উঠেছিল। আগেকার হাসি আর ছিল না। প্রতিদিন—প্রতি সময়েই ঔষধ দেওয়া, পথ্য দেওয়া যখনই আমরা তার কাছে যেতুম, উৎকর্ণ হ'য়ে, তৃষিত নয়নে সে তাকিয়ে থাকত। বুঝি ঈপ্সিত বস্তুটী তার দিতে গেছি।

কিন্তু পেত না...মুষ্‌ড়ে প'ড়েছিল তাই।

আজকাল আর তত ব্যাকুল হয় না—

কিন্তু দিন দিনই শরীর তার ভেঙ্গে প'ড়চে।

ওর কথা ভেবে মনে বড় দুঃখ জাগে।

নারী জাতিটাই তবে অভিশপ্তা! ..

তাই যেদিন জান্‌লুম চোখে আর ভাল দেখ্‌তে পায় না—ভাব্‌লুম, তোকে ভগবান বাঁচিয়েছে রে। একখানা কাগজ দিয়ে ব'ল্‌লুম, তোমার চিঠি এসেচে—

চিঠি এসেচে? চিঠি......চিঠি, চিঠি...আনন্দে দেহ তার নেচে উঠ্‌ল। শিরা, উপশিরা পর্য্যন্ত।

যদি পার্‌ত নিশ্চয়ই সে লাফিয়ে উঠ্‌ত। চিঠিখানা খুল্‌লে কিন্তু প'ড়তে পারলে না।

আমরা তো তা জান্‌তুমই।......

কাতরে ইলা ব'ল্‌লে, দিদি?

প'ড়ে দিলাম। মিথ্যার ইতিহাস......রাশি রাশি প্রেমের বুলি আর যৌবনের স্বপ্ন সুন্দর ছবি শুনিয়ে দিলুম।

আনন্দের আবেগে সে চিঠিখানা বুকে চেপে ধ'রল। এযেন তারই প্রিয়তম।

চুমু দিয়ে চিঠিখানা লালাসিক্ত ক'রে দিল।

তারপর ব'ল্‌লে, দিদি ভাই একটা উত্তর দিয়ে দাওনা। লিখে দাও—ভেবোনা, ভাল হ'য়ে যাচ্ছি। তবে চেহারাটী খারাপ হ'য়ে গেছে। তোমায় কতদিন দেখিনি। তুমি মন খারাপ ক'রোনা...... এই সব।

ফি' হপ্তাতেই এই ভাবে তাকে এক একখানা চিঠির কথা শোনাতে লাগলাম। তাতেই তার কী

তৃপ্তি! হেলেন সেদিন ব'ল্‌লে, এই ইলা, তোমার lover যে চিঠি দিয়েচে গো। লিখেচে তুমি শীগ্‌গিরই ভাল হ'য়ে ওঠ। তোমায় সে বিয়ে করবার জন্য অপেক্ষা ক'রচে। ভাল হ'লেই বিয়ে ক'রবে।

ছোট্ট খুকীর মত হাসি মাখা স্বরে সে ব'ল্‌লে, সত্যি? আঃ কী মজা! তা আমি জানি সে আমাকে এমনিই ভালবাসে। আমিও তো ভাল হ'য়ে উঠ্‌চি।

তারপর বিয়ের বিষয়ে কত কথাই ব'ল্‌তে থাক্‌ত। আমাদের কাকে কাকে নিয়ে যাবে, কি ভাবে Honey moon কোথায় enjoy ক'রবে এই সব ঠিক ক'রত। শৈলবালা ব'ল্‌ত, লিখেচে—চেহারা খারাপ হ'য়েচে তো কি হয়েচে? তোমার ওপর আমার ভালবাসা ঠিকই আছে। থাক্‌বেও। আগে আমরা বিয়ে ক'রে সংসার পাতি তারপর দেখো।

উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে ইলা ব'ল্‌ত, কী দিদি ব'লেছিলুম না?

ব'ল্‌তুম, হ্যাঁ—

ভাব্‌তুম, সার্থক তোর ভালবাসা বোন্‌। আশা পুরুক্ আর না পুরুক্ ভাল তো বেসেচিস্ তাই তোর জীবন ধন্য ক'রে দিয়েচে। তার প্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মানে আমাদের চিত্ত অবনমিত হ'য়ে আস্‌ত।

এই ভাবে কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো ইলার।

একদিন একেবারেই কেটে গেল।

অভাগিনী মরার পরেও বুকে সেই মিছা-চিঠিগুলোই জোরে ধ'রেছিল। মরণের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত ব'লেছিল, দিদি সে যদি আসে, ব'লো বিয়ে হ'লো না ব'লে যেন দুঃখ না করে। স্বর্গে আমাদের মিলন হবেই।......

কিন্তু ইন্দ্রজিৎ তখন হয়ত আর কারও প্রেমেই মাতোয়ারা হ'য়ে আছে।—

অভাগিনীর কথা ভেবে চোখ্ ঝাপ্‌সা হ'য়ে এল জলে। তার মৃত দেহের পানে তাকিয়ে কেঁদে ফেল্‌লুম।...

এই সব কাটা-ছাঁটা ঘটনাই আমাদের তিরিশ দিন্‌কার জীবন-যাপন্......আমাদের রোজনাম্‌চা।—

নার্স লুইসা চুপ ক'রে গেল। ঘরপোরা—নরনারী সবাই নীরব। অভাগিনীর অতৃপ্ত আত্মার কথা ভেবে শুধু এক একটা গভীর নিঃশ্বাস বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছিল—ধীরে, ধীরে......অতি সকরুণে।*...... ...

* সত্যি ঘটনা নিয়ে ভিত্তি তৈরী

এই তরুণীরে চিত্তভরি নিও

শ্রী জ্যোৎস্নানাথ চন্দ

আজি মোর জীবনের ভরা ব্যর্থতায়
তুমি যবে না চাহিতে ভরি দিলে হায়
পথ-শ্রান্ত শ্রাবণের শ্লথ পাত্র মাঝে
ধরণীর হাসি-গান—লক্ষ-কোটী কাজে
অমনি হেরিনু তোমারে, হে অপরূপ!
আজি তাই হাতে লয়ে কামনার ধূপ
আসি নাই তব দ্বারে! নব নব রূপে
নিখিলেরে সচকিয়া চুপে চুপে
নিত্য যেতে আমারই এ প্রাঙ্গণ দিয়া,
তবু চিনি নাই, চিনি নাই তোমা প্রিয়া
তাই বুঝি দিগন্তের দীপ্ত অন্ধকার
প্রাণের প্রান্তর পানে চাহে বারম্বার।
আজি এই তরুণীরে চিত্তভরি নিও—
হে মোর অন্তর-বাসী, অনির্ব্বচনীয়।

অসম-ছন্দ

(বড় গল্প)

শ্রী শচীন সেনরায়

—প্রথম—

কিপ্‌টে যাদবদাসের হঠাৎ সখ চাপ্‌লো—বাড়ীতে দালান দিবে।

শুনে পাড়ার সকলেই অবাক্ হলো। যে লোক নাকি নেংটী পরে পয়সা করেছে, যে নাকি আধো-পেটা খেয়ে পয়সা করেছে তারও আবার সখ দালানে থাক্‌বে।

দালানের ছাদ আর আস্তর বাদে প্রায় সবই হয়ে গেছে।—

ছাদ নির্ম্মানের কাজও সুরু হয়েছে।—

পিটাতে লেগেছে একদল ছোঁক্‌ড়া কাঁচা ছাদের বুকের 'পরে বসে। ছোঁক্‌ড়া খাটাবার ভার নিয়েছে গদাধর সর্দ্দার। ওদের কাজে উৎসাহিত করবার জন্যে চমৎকার এক ফন্দি এটেছে। রদ্দি-পড়া পুরাণ সারিন্দাটার 'পরে ওর মুলো হাতটা দিয়ে ছর টেনে বাজিয়ে সুর রাখে, আর ভাঙ্গা কাশীর মত বিশ্রী মোটা সুরে গায়,—'কানাইরে গুণের ভাইরে কানাই মার কতা কি মনে পড়ে না'—

'মনে পড়ে না'—খালি এই কথা কয়টীই ছোঁক্‌ড়ার দল সমস্বরে ধূয়ো টানে, তালে তালে মিত্র-ছন্দের মতন কোবা দিয়ে পেটায়। বাড়ি বেতাল হ'লেই রক্ষা নেই—গদার কষা চাবুক সপাং সপাং পিঠে পড়ে।

আবার ঘাড় বাঁকিয়ে গদাসর্দ্দার অন্তরা গায়—'মাঝে সদা নন্দ-রাণী হাতে লয়ে ক্ষীর ননী গোপাল গোপাল বলে করেছে রোদনা'—

'করেছে রোদনা'—ওরাও ধূয়ো ধরে।

ওই সমস্ত পংতির মধ্য থেকে একটা ভদ্র গোছের ছেলেকে আবিষ্কার করলে, কাছে ডেকে এনে গদা জিজ্ঞেস করলে—এই, তোর বাড়া কোথায়? সুরটা তো বেশ মিঠা! তোর নামটী কি, বাবা?

ছোকড়া জবাব দেয়—বাড়ী-ঘর কিচ্ছু নেই। অন্যের বাড়ীতে থাকি। কাছেই একটা গ্রামে।

গদা শুধোয়—বেশ! নামটী কি, বাবা?

—জ্ঞান শঙ্কর।

তড়াক্ করে মুখটা একটু খিঁচে গদা বল্লে—ওরে বাবাঃ! জ্ঞান আবার শঙ্কর! না-নাঃ জ্ঞান শঙ্ক-টঙ্কর মনে থাকবে না। তোকে ডাক্‌বো শুধু জ্ঞানু বলে—কেমন?

জ্ঞান কেবল ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

গদা আবার শুধোয়—তোর বাপ বেঁচে আছেন তো?

জ্ঞান বল্লে—না।

—মা?

—মা-ও নেই। মুখটা ম্লান হয়ে যায়।

—আহাঃ!...যাক্, তোর আর কোবা পেটাতে হবে না। কেবল আমার সাথে গান গেয়ে আমাকে সাহায্য করবি। বুঝ্‌লি?

জ্ঞানের হঠাৎ উন্নতি দেখে অন্য সব ছোকড়ারা হিংসায় মরে যেন। একটু সুবিধা পেলেই ক্ষেপায়। কত প্রকার চোঁট্‌কা কথা শুনায়। জ্ঞান কিন্তু একটারও কোন প্রতিবাদ করে না। টিট্‌কারীর চোট বেশী বাড়লে শুধু ওর কান দুটো গরম হয়ে পড়ে, আর ভাসা-ভাসা কুচ্-কুচে চোক দুটোও সজল হয়ে আসে

ঘণ্টা বাজে—পাঁচটার ঘণ্টা।

ওদেরও ছুটী তখনই। তাড়াতাড়ি ছোকড়ার দল দৌড়ে ছুঁট্রে যায় কাছেই একটা পুকুরে, চূণ-সুরকী মাখা হাত-পা ধোয়। দলের মধ্য হ'তে একটা তেঁদর ছোড়া জ্ঞানের দিকে চেয়ে বল্লে—তোর কি-রে, চাঁদ! সর্দ্দারের নজরে পড়েছিস্—হাত-পা আর ধোচ্ছিস কেনে? গতর তো আর খাটাতে হয় না।…

গদা সর্দ্দার সারিন্দা বাজায় আর ওর শেখান গানগুলি জ্ঞান মিহি সুরে গায়। ভারী মিষ্টি লাগে।

ওই বাড়ীর সাহসী মেয়েটা একেবারে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে গান শোনে, মুগ্ধ হয়ে পড়ে।

জ্ঞানকে দেখলেই ভারী ধারালো চোকে কটাক্ষ মারে, ইচ্ছা-ইচ্ছা করেই যেন ফিক্-ফিক্ করে হাসে, পেঁচান বেণীটা কখন কখন খুলে নিজের গায়েই বাড়ি মারে।… কোন দিন বা নিজের হাতেই চুমো খেয়ে জ্ঞানকে দেখায়।

জ্ঞান যেন তা একদম হুস্ই করে না। ভ্রুক্ষেপও নেই। গতিকে কোনদিন যদিই বা আৎকা চোক পড়্লো তক্ষণই ও কাঁচু-মাচু হ'য়ে গিয়ে অন্য দিকে মন দেয়।

যাদবদাসের ভিতর বাড়ীতে যাবার রাস্তা বড় ঘরটার কোনা কেটে যেতে হয়। ফক্কর মেয়েটা দোরের সাম্নে বসে বসে কমলা চিবাচ্ছিল আর সেগুলো জড় করছিল। জ্ঞানকে ওইধার দিয়ে আস্তে দেখেই জমান খোসাগুলো ওর গায়ে ছুড়ে দিলে, পরক্ষণেই বল্লে—আহাঃ! গায় পড়েছে? দেখিনি, মাইরি। মাপ্ ক'রো।

জ্ঞানও তখন একবার থম্‌কে দাঁড়াল, পরে শুধু বল্লে—না। থাক্—

প্রায়ই এইরকম কারসাজি চলে দুষ্টু মেয়েটার—

জ্ঞান নেহাৎ গো-বেচারীর মতন সব সয়ে যায়—

আজের দিন খাটুলেই ছাদ পেটাবার কাজ শেষ হয়ে যাবে।—

গদাসর্দ্দার তুমুল বেগে লেগেছে কাজ করাতে। অনেক প্রকার আকথা-কুকথা মিশান গান বেঁধে গেয়ে গেয়ে ছোক্‌রাদের মেহান্নতের আসান দিচ্ছে। তা' গেয়ে ছোকরার দলও কষে কষে বাড়ি খিচ্‌তে লেগেছে—যেন তাড়ি খেয়েছে আরকি।

তবুও সারা হয় না; অল্প কিছু কাজ বাকী রয়ে যায়। পরে 'উপরটাইম' খেটে সবটুকুন্ সমাধা করে দেয়।

সন্ধ্যা উৎরে যাবার মুখে। দুর্দ্ধর্ষ সবিতার তীব্র আলো ক্ষর্ব্ব হয়।

ছুটী পেয়ে ছোক্‌ড়াগুলোও হই-চই করে দৌড়ে চলে সব।

গদাসর্দ্দারের সারিন্দা এবং আর-আর সব লোয়াজিমা গুছিয়ে আন্‌তে জ্ঞানার আস্‌তে একটু দেরী হয়েছিল। বাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে ঠিক এমন সময় যাদবদাসের সেই মেয়েটা ওকে পাক্‌ড়াও করলে। একটা লালসা-মাখা কটাক্ষ হেনে মেয়েটা একটু ঠাট্টার সুরেই বল্লে—আঃ! ঢং দেখে বমি আসে। যে বা ছাতার গলা-ই তার আবার ফষ্টি কত! সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কত! এত বাথ্‌নাই কেন?

শুনে জ্ঞান টক্-ভোলার মত চেয়ে থাকে, পরে শুধু বল্লে—বেশ! বল্‌চি তো—আমি পারি না।

গন্তব্য পথে আবার চলে।

অনেক দিন অতীত গর্ভে ডোবে, পরিবর্ত্তনের সাড়া আসে।…

জ্ঞানকে আগের মত হাড়-ভাঙ্গা ক্লেশ ও পরিশ্রম করতে হয় তো না-ই—চূণ-সুরকীর উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গানের সুর পর্য্যন্তও টান্‌তে হয় না। দৈহিক শ্রমের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেও মানসিকটা তো করতে হয়।

স্কুলে পড়লো, প্রবেশিকার দ্বারও উত্তীর্ণ হলো, আই-এও পাশ করলো। এখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। বেশ নিশ্চিন্তেই পড়া-শুনা করে যাচ্ছে। খরচ পত্রের জন্য তো আর ভাবনা নেই—গদাসর্দ্দারই তো খুশীতে চালায়। কী চিন্তা

সন্ধ্যের সময় কাজ থেকে ফিরে এসে গদা ওর মুলো হাতটা বাড়িয়ে দেয় জ্ঞানের কাছে, কেঁকাতে কেঁকাতে বলে—ওঃ দে-নারে একটু টিপে! আর পারিনে, বাবা—এই মুলো হাতটা নিয়ে!

ও-ও হৃষ্ট মনে দেয়।—

ভূমিকম্পে মাটী ফাটে, দালান কোঠা ভাঙ্গে। ঝড়ে সর্ব্বনাশ করে জীর্ণ-দীর্ণ কুড়ে ঘরগুলো আর নিরীহ গাছ-গাছরাগুলোকে। বন্যায় ভাসিয়ে নেয় কঠিন স্থলকে। এই তিন-তিনটে অসুরই যেন পৃথিবীর শত্রু। ভগবানের চেলা। আসে ওঁর হুকুম তামিল করতে, পাপী ধরণীকে জব্দ করতে।

... সেই রকম করে যেন গদাসর্দ্দারের প্রাণটাও নিয়ে গেল যখন নাকি ও ক্রস্ করছিল কলকাতার একটা বড় রাস্তা, তখন একখানা মোটর দৈত্যের মতন এসে চাঁপা দিয়ে।

তক্ষন তক্ষনই কিন্তু মৃত্যু হয় না। একটু যেন থাকে কা'কে শেষ দেখা দেখবার অপেক্ষায়—

কলেজ-ফের্ত্তা জ্ঞান ঘরে না প্রবেশ করেই উঠান থেকেই ডেকে-ডেকে খোঁজ করে—গদাখুড়ো, কখন এলে? কেমন আম্‌দানী হলো ইত্যাদি। রোজ।

সেই দিন আর কেউ সারা দিলে না। ভাবলে, হয়ত এখনও ফেরেননি। আস্তে আস্তে শীস্ দিতে দিতে ঢুকলো। পরে ঢুকেই যা দেখলে তাতে বিস্ময় বিহ্বলের আর সীমা থাকে না। গদার ছিন্ন-ভিন্ন ল্যেছ্‌ড়া দেহটা মাটীর 'পরে লুটোচ্ছে। জ্ঞান খানিকক্ষণ পলক-না-পড়া চোকে চেয়ে থাকে। ত্রাসে বুকটা দুরু-দুরু কাঁপে। অবিশ্রান্ত অ-ঝোড়ে কাঁদে। একটু সাম্‌নে গিয়ে ওর অসার মুলো হাত খানা তুলে নিজের গলায় পেঁচিয়ে রাখে আবার কাঁদতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। বুঝতে পেরে গদারও দু'ফোটা অশ্রু ঝরে' পড়লো বিষণ্ণ চোকের দু'কোন বেয়ে। তারপর অতি কষ্টে ঘ্যাঙ্গাতে ঘ্যাঙ্গাতে একটা অতল কথার সুরে বল্লে—বেঁচে-থাক্,—বা—বা

শেষে সেই দু'ফোটা অশ্রু পড়ার মতন করেই প্রাণবায়ুটাও উধাও হ'লো।—

কচি চারা গাছগুলোকে মাটী চাঁপা দিলে আর বাড়তে পারে না; পাখীর ডিমগুলোকে তা' না দিলে বাচ্চা হয় না; মুকুলের জন্ম নেওয়া মাত্রই ছিড়ে ফেল্লে আর ফল হয় না।

সেই রকম একটা হেতুতেই জ্ঞানেরও পড়া-শুনা আর হয় না। বাঁধা পড়ে। নেহাৎ একটা 'ভেগাবন' বনে যায়। যখন সে ভাবলে, ছন্নছাড়াকে তো আর কেউ পোষবে না তখন অনেকখানে হত্যে দিতে সুরু করে চাকুরীর উদ্দেশ্যে; কত যায়গা হ'তে ম্লান মুখে ফিরে এলো! কত জনকে যে খোসামুদি করলে। কেউ ফিরেও তাকায় না। শেষে অনেক প্রকার চেষ্টা-চরিত্রের পর এক সাহেবের অনুগ্রহে এবং কৃপায় এক মস্ত 'ফেক্টেরীতে' শিক্ষার্থী ভাবে ঢোকে।

জ্ঞান নাকি কবে সেই সাহেবকে একদিন কি একটা উপকার করেছিল, তাই উনিও প্রত্যোপকার করলেন।

মটর ইঞ্জিনারিংএর আলিসান কারখানা ঘেঁস্-ঘেঁস্, কড়াকড়্, ফাটুম্-ফুটুম্ শব্দ সেই বেলা দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত। যেন দশ পোনারটা হাট মিলেছে আর কি। যেন বিপুল উদ্দ্যমের পরকাষ্ঠা দেখাচ্ছে সব্বাই।

কার যেন একটা পুরাণ গাড়ীর চাকা ঝালা দিতে দিতেই সাথেই জোগাল দিচ্ছে যে ছেলেটা, তাকে

জ্ঞান বল্লে—ভানু, আস্‌বি এখেনে? এই রড্‌টা একটু শক্ত করে ধরে থাক্ ততক্ষণে আমি বাইরে গিয়ে একটা টান্ মেরেই চলে আস্‌বো। আয়।

ভানু বল্লে—বেশ তো, যাও না।

ভানু কিন্তু ওর ভারী অনুগত হয়ে পড়েছে। দরকারের সময় অনেক কাজ-কর্ম্ম করে দেয়। অনেক ঠেকা-বেঠেকা ভানু চালিয়ে নেয়। প্রায়ই ডাক-খোঁজ করে। তাই জ্ঞানও যেন ওর উপর ধীরে ধীরে নিজেকে সমর্পণ করে দিলে। ভানুকে ও ভালবাসে খুব, স্নেহ করে। ওর মনের সাথে এর মন খাঁপ খায়। দু'জনের ক্ষনেকের অদর্শনই যেন দু'জনকে ব্যাকুলিত করে। ভানুকে ও আত্ম-জীবন চরিত একদিন শুনিয়েছে—কি ভাবে তার জীবনটা গঠিত হয়েছে, কাঁর দয়ায় বি-এ ক্লাশ অবধি তার নাম উঠেছিল, কি ভাবে ঐ দয়াবান্ ব্যক্তিটী মারা গেল! কত ভালবাসতো উনি তাকে।

যতখানি ভাল লাগ্‌ত জ্ঞানের এসব কাহিনী বল্‌তে ততখানি ভাল লাগার মতন মনযোগ দিয়ে ভানুও শুন্‌তো।

অধিক নৈকট্য হেতু তারা দু'জনেই আকৃষ্ট হয়।

মানুষকে নেহাৎ আপন করা যায় তখনই যখন নাকি অকৃত্রিম সহানুভূতিতে ভরপুর হয়ে একে অন্য একজনের জন্যে কাঁদতে পারে

* * * *

জ্ঞানের আর 'কোর্স' শেষ করবার বেশী বাকী নেই। কল-কারখানা,যন্ত্রপাতির কাজটা বেশ আয়ও করেছে। এখন শুধু 'ড্রাইবিং' শিখে পরীক্ষা দিয়ে একটা সার্টিফিকেট আদায় করতে পারলেই কাজ নিবে। তা-ও হয়ত বড় জোড় ছ'মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। তারপর? তারপরও তো আবার সেই চাকরী! যা নাকি বি-এ ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়েও কত থানে কত হানা দিয়েও জোটেনি।

এই চিন্তায় তাকে খুব বিষণ্ণ করে।—

এই বার চাকরী মিলে গেল সত্বরই; যেমন সত্বর করে নাকি লাভ করেছিল বাল্যকালে নির্ম্মল সৌখ্যতা মহাপ্রাণ গদা সর্দ্দারের সাথে।

কলম পিশে পেট চালানের চাকরী না কিন্তু,—এক মেয়ে স্কুলে 'বাস' ড্রাইভারী।

হঠাৎ এগুলো বিভিন্ন মেজাজের মেয়েদের মন তামিল্ দিয়ে চলা যেন ওর কাছে এক রকম বিষম ব্যাপার হয়ে উঠলো। কতিপয় দু'জন চারজন বন্ধু ছাড়া তো সে কারো সাথে বড় একটা মিশেনি। স্বভাবটাও গড়ে উঠেছে ওই রকম ধাতেই।

কার্য্য-ক্ষেত্রে পড়ে নাকি সব-ই সয়।—

জ্ঞানকে গো-বেচারীর মত দেখে ইস্কুলের তুখর মেয়েগুলো প্রথম প্রথম ভারী অন্যায় মত নিজেদের সুখ-সাচ্ছন্দ্য করে নিত।

মেয়েদের বাড়ী পৌছান কাজ' চলে একেবারে সন্ধ্যা নাগাৎ। জ্ঞানকে বাসায় ফিরতে হয় সন্ধ্যারও অনেক পরে। বাচাল মেয়েদের অবিশ্রান্ত বাক্য বানে তাঁহাঁ-তাঁহাঁ-করে-ওঠা প্রাণটা তুষ্ট হয়—বাড়ী এসে ভানুর সাথে একটু আলাপ করে।

কথায় কথায় একদিন সনির্ব্বন্দ অনুরোধ করে' ভানু বলেছিল—জ্ঞানদা এখন তোমার জীবনটাকে একটু রসাল করা দরকার। বেশ ভাল দেখে-শুনে একটী—কেমন? কর্ব্বো নাকি খোঁজ?

কথাটা জ্ঞান যেন শুন্‌তেই পায়নি এমন একটা ভঙ্গি করে সে শুধু বলেছিল—তুই আমার শত্রু না মিত্র?

—কেন, বলতো?

—না, এই এম্নিই জিজ্ঞেস করচি?

—তুমি কি মনে কর?—শত্রু?

—ইয়ার-বাজ! আর ফাঁজলামো করিসনে। বল্লুম।

—বা-রে, ফাজলামির কি দেখলে? কেন আমার বুঝি সাধ করে না কাউকে বৌদি ডেকে প্রাণ জুড়াতে?

—বৌদি যদি ডাকবার অত সখ হ'য়ে থাকে তবে ওই বাড়ীর বৌটাকে ডাক্‌লেই হয় ?

—বাঃ, তাকে কেন ডাক্‌বো ? যাক্, আরে জ্ঞানদা তোমার একটা চিঠি আছে। এনে দিচ্ছি।

জ্ঞান জিজ্ঞেস করে—কে লিখিছেরে ?

ভানু মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে উত্তর করে—তা আমি কি করে জানবো ? আমি কি তোমার চিঠি-পত্র পড়ি যে জানবো ?

—ক'বে থেকে এই সুমতি হ'লো ? আধঘণ্টা যাবৎ ? বল্‌না কে লিখিছে ?

—কি জানি, তোমার কে একজন দুঃখীনী নারী দশটাকা সাহায্য চেয়েছেন।

বলেই ফিক্ করে একটু হাসে।

—হুঁ ! কিরে মিথ্যুক তুই বুঝি ওঁর কথা আর শুনিস্‌নি ?

—অঃ-হোঁঃ ! সেই যে,—সাইকেল করে কলেজ যেতে একদিন চাপা দিয়েছিলে যার ছেলেকে,—সেই তিনি তো—না ?

—হাঁ। এই না বলে তোকে কিচ্ছুই বলিনি ! তবে যে খোঁটা দিস্ ?

সন্ধ্যা উৎরে গেল ! রাত আস্তে-ধীরে গড়াতে থাকে।

জ্ঞান শ্রান্তি বোধ করে। সেই দিনের মত আলাপ দু'জনেই মুল্‌তবি রাখে।—

'বাসে' একটু আরাম করে বসে যাবার জন্যে একটা ভাল যায়গা অধিকার করবে বলেই সব্বার আগে এলো সুলতা। দেখে জ্ঞানকে ছোট্ট একটা আরসি ও চিরুণী পকেট থেকে বার করে অগুছাল্ চুলগুলি বেশ পাট কচ্ছে। একটুখানি বিদ্রূপপূর্ণ চোরা হাসি হেসে বল্লে—কি ড্রাইভার বাবু, খুব যে ! চুলের পাট হচ্ছে। ঐ তো চেহারা—

আচম্‌কা ডাক শুনে চোখ তুলে দেখলে পরে হয়ত মনে মনেই বল্লে—তবু তোর চেয়ে ভাল। ঐ তো বাঁকা মুখ, তার উপর আবার মুখে এক ঝুড়ি ব্রণ, মাথার চুল দেড় হাতও হয় কিনা সন্দেহ। রোগা তো রোগা—তার উপর আবার লম্বা যেন একটা পাটখড়ি ! ইস্কুলে পড়তে না দিলে দেখা যেতো কে তোকে পোঁছে !

ছুটীর বেল বাজে—

ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ের দল দৌড়ে কীল্‌বীল্ করে বার হয়।

বাস ভর্ত্তি হোতে না হোতেই সুলতা আবার ওকে শুনিয়ে শুনিয়েই ঠাট্টার সুরে বল্লে—এখন একবার মর্জি করলেই তো হয়। পেটের ভাত যে শুকিয়ে গেছে ?

পাশেই এসে বস্‌লো কমলা।

জ্ঞানের অপাঙ্গে ওর কাছে সুলতা বল্লে—কমলি, আমাদের এই নতুন ড্রাইভারটার কিন্তু বাবুয়ানীর দিকে খুব ঝোঁক ! পকেটে তো এক 'সেট' আরসি আর চিরণী আছেই। যখন খুসী পাট্ করে।

কমলা হাসে। পরে সেই রকম ঠাট্টার সুরেই ঠোঁট্ একটু বাঁকিয়ে বল্লে—তোমার উপর বুঝি গিল্টী করা হচ্ছে। মন্দ না। চেহারাখানাও তো আর নেহাৎ অ-ভদ্রলোকি না, আবার বয়সটাও যুবা ! সুলতা, ওকে বলিস্ মাত্রা যেন না বেড়ে যায়, তা' হ'লেই মাটী করবে।—কোন্ দিন হয়ত দেখ্‌বো শেষে—এই যে গিয়ে—এই মমতাদি'কেও অন্য কিছু ডাক্‌তে—

শুনে চট্ করে কান দু'টো গরম হয়ে পড়্‌লো। আর যাতে অন্য কিছু না শুন্‌তে হয় তাই 'বাসের' ষ্টাট দিবার যন্ত্রটা টিপে ঘ্রে-ঘ্রে করে ভীষণ শব্দ করলে তার উপর আবার হর্ণ-টাও টিপে ধরে রাখলো।

তারপর মনে মনেই কমলাকে কড়া গাল দিয়ে হৃদয়টাকে পরিতুষ্ট করলে—অলক্ষ্মী গোঁফা মেয়েটা ! তুই কেন আসিস্ রোজ তোর গোঁফ কামিয়ে ! মনে করিস্ অদ্দুর থেকে তোর গোঁফ বুঝি কেউ

আর দেখ্‌তে পায় না? মেয়েদের গোঁফ! ছিঃ ঘেন্না

পরে ওর উদ্দেশে এক দলা থুঁতুই ফেল্লে।

খানিক বাদে কুমারী শ্রীমমতা দেবীও উঠলো, অগ্নি 'বসি'ও ছুট্‌লো।—

লত-জড়ান গাছটা কেটে ফেলা হ'লো, নিরাশ্রয় লতাগাছিকে কঠিন মাটীই শেষে বুকে জড়িয়ে নিলে। প্রেমিকের প্রেম ব্যর্থ হ'লো শেষে নির্ম্মম মৃত্যুই ওকে সোহাগ ভরে চুমা খেলো।

নিরাশ্রয় ভাবে কেউ থাক্‌তে পারে না; তাই কি এই সবের সৃষ্টি?—

বেশ কিন্তু—

এত সকল টিট্‌কারী, ইয়ার্কি, খাঁজলামিতে জ্ঞানের নিরিবিলি অন্তরটা ঢের বিষিয়ে উঠ্‌তো,—হয়ত বা চাট্টীই তুলতো কোন্ দিন, যদি না পেতো এত সকলের ভিতরও একটুক্‌রা মিষ্টি স্নেহ—

......করি?

......মমতাদি'র।

প্রথম আলাপ ঐ দিনই যেদিন নাকি মমতা 'বাসের' জানালার ধারে বসে তার হাতের আংটী নিয়ে একবার খুল্‌ছিল আবার পরছিল। এম্নিকরে খেলা করতে করতে যখন ফস্ করে পড়ে গেল একেবারে মাটীতেই তখন 'বাস' থামিয়ে ওটা তুলে দিতে অনুরোধ করেছিল জ্ঞানকেই।

জ্ঞানও চটাপট্ 'বাস' থামিয়ে তুলে দিলে।

এমন একটী শান্ত, গম্ভীরা ও স্নেহশীলা মেয়ের জন্য এই অকিঞ্চিৎকর কাজটুক্ যে করবার অবসর পেয়েছিল তাতে যেন জ্ঞানের প্রাণটা অপরিসীম গর্ব্বে পুরিত হলো আরও বেশী।

জ্ঞান প্রায়ই মনে করে কি কমণীয়তা, কি স্নেহশীলতা ও কি বন্ধুতা মেয়েটীর মুখে-চোকে, যেন উপ্‌ছে পড়ে আর কি। তা আবার এত সচ্ছ ও তরল! যেন এক চুমুকে অনায়াসে পাণ করা যায়

এঁদো, ধোঁয়া-ওঠা, কচড়া গলিটা দিয়েই যাচ্ছিল পায়ে হেঁটে।

শীতের ম্লান বিকেল!

হঠাৎ সাজ-গোজ করে অকালেই বৃষ্টি এলো। এই সময়ের বৃষ্টি ভারী অসহ্য লাগে,—যেমন অসহ্য লাগে ধাঁড়ী মেয়ের ফাঁজলামী, সদ্য বিধবার কেশ প্রসাধন।

জলের হাত থেকে অব্যাহতি পা'বার জন্য সাম্নেই একটা বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে আশ্রয় নিল।

চার পাশে দুর্গন্ধের বহর ছোটে; পঁচা, আঘাটে, নোংড়া—

জ্ঞান দাঁড়িয়ে থাকে। ব্যাকুল চোক্ পাংশু ঘোলাটে আকাশে পড়ে।

গুড়-ভর্ত্তি একটা বাটি হাতে কে একজন লোক এসে ওকে দেখে থম্‌কে দাঁড়াল,—দেখি গো মশাই, রাস্তা দিন। যাব।

বলেই মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়েই জিজ্ঞেস করলে—আপনাকে যেন চিনি চিনি! আ-রে, জ্ঞানু যে? এখানে?

—মাথা বাঁচাতে।

—বেশ। চিন্‌লি আমাকে?

—খুব। জ্ঞান উত্তর করে। স্তিমিত আঁধার রাতের তারার মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে ওর মনে শৈশবের কর্ম্মঠ অতীত জীবনের কথা। কেমন করে সুরকী চুণের উপর পা রেখে কোঁবা পিটাত, কেমন করে এই বিজু ওর কাছে বসে কোঁবা পিটাতে পিটাতে ঠাট্টা করেই চুণ সুরকীর জল ওর গায়ে ছিটিয়ে দিত। কেমন করে প্রায়ই ঐ বাড়ীর দুষ্টু মেয়েটার সাথে ইয়ার্কী ঠুক্‌তে চাইত এবং মেয়েটাও কেমন করে পা তুলেই লাথি মারবার মতন করে দেখিয়ে বিজুকে একদিন জব্দ করেছিল।

বিজু জিজ্ঞেস করে—এখন কি করিস? রাজ-মিস্ত্রীগরি না অন্য কিছু?

জ্ঞান জবাব দেয়—নারে, এখন মোটর চালাই। আর তুই?

—আমার কথা—আমি সেই রাজমিস্ত্রীই। আয় না ভেতরে, ভাই? এখানেই থাকি।

—একাই—না গীন্নীও আছে?

—বিয়ে করলে তো গীন্নী! কিন্তু তবু একাও থাকি না—

—খুব গাড়-চালাকী হচ্ছে যে!

—মাইরি না!...তবে প্রীবিত্তির সাথে জুযতে একজনকে গৃহিতা ভাবে রেখেছি।

—এই দুর্মতি যে?

—আছি বেশ, কোন বন্ধন আর জীবনে রাখি না; যে দিন অতৃপ্তি লাগ্‌বে তালাক্ দোবো!

বৃটির একটু সেক্ দিল—

—আজ যাইরে। অন্যদিন একবার সময় মত ঠিক আস্‌বো। কেমন?

—বেশ, আসিস্ তোর খুশী মত যেদিন হয়।

জ্ঞান সারা রাস্তা কেবল চিন্তা করতে করতেই চলে—কি সব লোকের প্রবৃত্তি, কি সব নিছক বাসনা!

সন্ধ্যা ধরণীতে পাত বিছাবার জন্য উৎগ্রীব হয়ে রয়েছে।

ক্রমশঃ।

বস্ত্র হরণ

শ্রী হেম সেন

গরবিনী গোপী
তন্-মন্-ধন্
কুল-মান সব সপি',
ভাবে মনে মনে
শ্যাম শ্যাম নাম
দিবানিশি তবু জপি'
একদিন সবে
পুলকিত অতি
হৃদ্-যমুনার জলে,
অমিয় ভাবিয়া
সিনান করিতে
গেল দলে দলে দলে।

মন কদম্ব
মূলে রাখি বাস
নামিল করিতে কেলী।
এল পীতবাস
পরি পীত-বাস
লাজ-বাস নিল ছলি'।
উঠিয়া বসিল
কদমের ডালে
দেখিতে লাগিল হরি।
ডাকিয়া কহিল
আসিয়াছি আমি
তবপদ অনুসরি।

তখন কিশোরী
'ব্রজ গোপীন্ কি'
লাগিল মনেতে ভয়।
মরমে মারিয়া
অমিয় সলিলে
দেহটী ডুবায়ে রয়।
কহে বিনাইয়া
বিধুরা গোপিকা—
কহ একি চতুরাই
সকলি দিয়াছি
সপিয়া তোমারে
বাকী কিছু রাখি নাই

তবে কেন আজ
হরি' নিলে লাজ
রিক্ত করিয়া মোরে!'
নারীর সকল
সঁপিয়া দেয় গো
লাজ রাখে নিজ তরে।'
নগনা মগনা
প্রেমিকা গোপিকা
কর জোড়ি নমে পায়
মরম জানিয়া
চতুর কালিয়া
ঘুচাইল সব দায়।

স্থষ্টির যে ক্ষুধা জাগে প্রকৃতির বুকে

শ্রী সত্যেন্দ্র দাস

বয়স তো উনিশের বেশী হ'তেই পারে না—

বেশ ছিপ্‌ছিপে গড়ন—হ্যাংলা মেয়েটি......

দুটি লিক্‌লিকে হাত...আঙুলগুলো যেন চাপার কলি. ...

চোখ দুটি ভারি সুন্দর......ডাগর—ডব্‌ডবে।

কিন্তু চাওয়ার মাঝে যেন বেবাক্ ব্যথা নিঙড়ে বেরোয়.........

হাতে আলো ছিল—

আস্‌বার পথে একটা দুরন্ত মেঠো হাওয়ায় নিভে বেঁচেছে।

আঠার মতো অন্ধকার, গায়ে লেগে থাকে যেন।

হোঁচট্ খেয়ে, হুম্‌ড়ি খেয়ে কোনোমতে ফিরে আসি-

করবীর হাতে অসুদের পুরেগুলো দিয়ে অশোকের মাথার কাছে বসি—

একটিবার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে ও বলে, অষুদ আর কেন ভাই—অষুদই যদি মানুষকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার্‌তো, তাহলে পৃথিবীতে কেবল গরীবেরাই মর্‌তো, যারা তা যোগাতে পারে না।—ও আর আমি খাবো না।

বুকের তাজা রক্তের মতো কথাগুলোকে নিঙড়ে ফেলে ও যেন নেতিয়ে পড়্‌লো।

একটা দুরন্ত বেহায়া হাওয়া বেটপ্‌কা ঘরে ঢুকে করাটাকে চৌকাঠের উপর আছাড় মেরে যায়—

আর্ত্তনাদ করে ওঠে—কবাটটা? না চৌকাঠ?—

বলি, অবুঝের মতো কথা বলিস্‌নে অশোক, আমার রাগ ধরে—

আর কথা বল্‌তে দেয় না—

বাঁধা দিয়ে বলে, ধরুক্‌। আর ক'দিনই বা। একটুখানি বিরক্ত করে যাই—

আমারো চোখটা সজল হ'য়ে ওঠে।

পৃথিবীর বেঁচে থাকার উপর ওর কত বড় অভিমান এ, আমিই কেবল বুঝ্‌তে পারি তা।

বেঁচে থাকার সহস্র উপকরণের মধ্য থেকে কারো জীবন যখন চলে যায়—সে কত বড় দুঃখ নিয়ে চলে যায়, ওর এ অভিমানের মধ্যে তা পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে......

পৃথিবীতে তারাই বাঁচুক—যারা জীবনকে সহস্র দিক দিয়ে উপভোগ করতে অধিকার পেয়েছে—যারা জীবনের ছোট তুচ্ছ মুহূর্ত্তগুলোকেও কৃপণের মতো গুণে গুণে ব্যয় করে—যারা জীবনের মাঝে মৃত্যুর কথা ভুলে যায়—

পৃথিবীতে তারাই মরুক্‌—যাদের চোখের জল, বুকের রক্ত শুকিয়ে মরুভূমি হ'য়ে গেছে,—যারা জীবনকে সহস্রদিক দিয়ে পলে পলে দুর্ব্বহ করে তোলে—যারা জীবনকে এক মুহূর্ত্তে ফুরিয়ে ফেল্‌তে চায়—যাদের বেঁচে থাকাটা অভিশাপ—যারা বেঁচে থাকা মানে না—

পৃথিবীতে তাহ'লে শান্তি আস্‌বে।

হেমন্তের ধূসর উদাস একখানি সন্ধ্যার মতো দেখা যায়—

ক্ষীণ মিইয়ে-যাওয়া পাংশু চাঁদের টুক্‌রোটির মতো—

হাত দু'টি বুকের উপর ভেঙ্গে জান্‌লা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ে—

থম্‌কে দাঁড়াই—

হঠাৎ একটা সহজ আবরণ উন্মুক্ত হ'য়ে যায়.....

করবীর জান্‌লা থেকে পাশের বাড়ীর একটি ঘর দেখা যায়—

আরো দেখা যায়—একটি তরুণী এক খোকা ফোটা-ফুলের মতো একটি খোকাকে বুকে নিয়ে আদর করছে......আদরই বা কত রকম!

কখনো তার কচি মুখখানি চুমোয় চুমোয় ভ'রে দেয়......

এ ঘর থেকেও তাঁর চুমার শব্দ পাওয়া যায়—

দেখি—দুষ্ট খোকা খিল্‌ খিল্‌ ক'রে হাসে......

পেছন দিয়ে ঘরে ঢুকে করবীর মুখের দিকে তাকাই—

সবখানি দেখা যায় না—

তবু মনে হয়—ও যেন একটি মূর্ত্তিমতী ব্যথা.....

বুকের উপর ভেঙ্গে রাখা হাত দু'খানির মধ্যে ও যেন একটি নিখিল সৃষ্টির ব্যাকুল কামনাকে জড়িয়ে আছে......

সৃষ্টির অধিকার সে চায়—

দুটি চোখের দৃষ্টি বেয়ে সে কামনা যেন ঝরে' ঝরে' পড়ে .....

চুপটি ক'রে চলে যাই—যেমন করে আসি......

সহানুভূতির কোমল উৎসটা বুকের মাঝেই একটা বিকট হাহাকারে ফেটে পড়্‌তে চায়......

সবটুকুই যেন ঢেলে দিতে ইচ্ছে হয়—

অশোককে বুঝানো যায় না—

ক'দিন থেকে ও যেন ক্ষেপে গেছে।

পাগলের মতো হাতটা চেপে ধ'রে বলে, মর্‌তে আমি চাইনে তুষিত,—মরবো না আমি। কেন,

কেন বাঁচ্‌তে পাবো না?—কি করেছি আমি এ পৃথিবীর যে, তার কোনো কিছু আমি ভোগ কর্‌তে পাবো না? বল্—তুই-ই বল্—

দুর্ব্বল কঙ্কালের মত হাতটা দিয়েই একটা ঝাঁকুনী দেয়······

ওতেই যেন বুকের পাঁজরগুলো অবধি কেঁপে ওঠে ওর······

কি যে বলি—ভেবে পাইনে।—

ও আবার বলে, মরে তো সবাই, কিন্তু এত বড় ব্যর্থতার ভেতর দিয়ে কার জীবন নিঃশেষে চুকে যায় বল্‌তে পারিস্—করবী যখন বুকের ভেতর মাথাটা গুঁজে দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদে, হাঁ কাঁদে—আমি বুঝ্‌তে পারি বুক আমার ভিজে যায়, তখন মনে হয় বুকটা যেন এখনি চৌচীর হ'য়ে ফেটে পড়্‌বে—

বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ জ্যামুক্ত ধনুকের মতো সোজা হ'য়ে আমাকে একেবারে বুকের উপর টেনে নেয়······

হঠাৎ যেন ওর গায়ে একটা মত্ত হাতীর বল আসে।

চোখ দুটোর দিকে তাকানো যায় না—

দুটো আগুনের গোলার মতো জ্বলে ওঠে। মনে হয়, এখনি ঠিক্‌রে পড়্‌বে যেন······

তারপর নিজের সমস্ত শক্তি এক ক'রে বলে—শুধু তুই-ই পারিস্ তৃষিত,—এ পৃথিবীতে আর কেউ নয়—শুধু তুই—বল, আমার এই শেষ অনুরোধ রইবে কিনা—করবীর মাতৃত্বকে—

আর বল্‌তে পারে না—

হয়তো আমিও আর শুন্‌তে পাইনে—

বিছানার উপর ও আছড়ে যায়······

একটা রবারের বলের ভেতর থেকে সবটুকুন্ বাতাস যেন এক নিঃশ্বাসে বেরিয়ে যায়।

ভাবতে পারি না—

সমস্ত পৃথিবীর আলো আঁধার আকাশ তারা চন্দ্র সূর্য্য—সব যেন একাকার হয়ে যায়—সারা সৃষ্টি যেন এক মুহূর্ত্তে রেণু রেণু হ'য়ে ধূলিকণার সাথে মিশে যায়।

মাথা যেন বন্ বন্ ক'রে ঘুর্‌তে থাকে—

কিন্তু কী উদার ওর বুকটা!

কি গভীর করেই না করবীকে ও ভালোবাসে!

পৃথিবীতে বুঝি এর তুলনা হয় না—

মনে হয়—দেবতা বলে' যদি কিছু থাকে, তারা এই অশোকের দল······

চোখে জল এসে পড়ে।

মানুষ যে কত দুঃখ সইতে পারে—কত বড় আঘাতেও তার বুক অটুট থাকে, তা চোখের সামনে দেখি আর—

মাথা নত হয়ে আসে······

গাছের পাতায় পড়ন্ত রোদ পিছ্‌লে পড়ে।

ঝির্ ঝির্ ক'রে হাওয়া আসে—ঘুমে পাওয়া হাওয়া যেন।

গাছের পাতাগুলো তির্ তির্ ক'রে ন'ড়ে—

যেন কুঁড়ের এপাশ-ওপাশ—কোনোরকমে একটু বেঁচে থাকার প্রমাণ দেওয়া যেন।

কি গভীর বেদনায় দুটি চোখ ভ'রে আসে ওর—

মেঘের মতো নিবিড় কালো চোখ দুটি······

অশোকের পায়ের উপর একখানি হাত রেখে গভীর ধ্যানে মগ্ন—

পৃথিবীর ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে যেন বেদনা-তপ্ত রক্ত-রাঙা মনখানি খুলে ধরেছে······

কত বড় নালিশ যেন ওর—

অশোকের আর সাড়া পাওয়া যায় না—

অবিরাম লড়াই করে সমস্ত দেহমন যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছে······

ঘুমিয়ে পড়্‌তে চায়—

কোন্ ঘুম ?

ডাক্তার মুখ ব্যাজার ক'রে বলে, বড় জোর আর তিন চার দিন—

দরজার পাশ থেকে ছায়ার মতো একটি মূর্ত্তি সরে যায়। হয় ডাক্তারের এই কথাটুকু শুনবার জন্য দাঁড়িয়েছিল। শুনুক্—

আর কেন মিথ্যে দিয়ে ঢাকা ?—তৈরী হ'তে দি'। উপরি উপরি রাত জেগে শরীর ভেঙে পড়্‌তে চাইছে—

সন্ধ্যেবেলা ভারী মনে ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে নিজের কুঠরীতে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

এক আধ ঘণ্টা যা বিশ্রাম ক'রে নেওয়া যায়।

নিবু-নিবু বাতিটা এক ফু'য়েই শেষ ক'রে দি'।—

জ্যোছ্‌না নয়—এক ঝলক্ তরল অন্ধকার ঘরের ভেতর গলে পড়ে জান্‌লাটা দিয়ে।

চোখের পাতা দুটো এক কর্‌তে চাই—

হয় না।······

কিন্তু কর্ত্তব্য যখন চারদিক থেকে ছেঁকে ধ'রে তখন ও দুটোকে ফারাক্ ক'রে রাখ্‌তেই অনেকখানি সামর্থ্য খরচ হয়······

একা মন পেয়ে চিন্তা এসে জুড়ে বসে—

ভাবি—আর ক'দিন এখানে ?

হয়তো তিন দিন······হয়তো চার দিন······

এর বেশী নয়—ডাক্তার বলে গেল—

কথাটাকে বেশ পরিষ্কার ক'রে বুঝি।

কিন্তু এর ভেতরে অশোকের না থাকার কথাটাই যে বেশী পরিষ্কার—বেশী সত্য—সেইটেই বুঝিনে।

অশোক চলে' যাবে—অশোক নেই—এ কথা ভাব্‌তেই সব গুলিয়ে যায়······

একথা সেকথায় মনটা ঘুরে ফিরে আবার পাপটাই ক'রে বসে—

যে কথাটাকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে চাই—সেইটিই বেশী ক'রে মনের চার দিকে গুণ্ গুণ্ ক'রে বেড়ায়

ইস্—কি কথাই না অশোক সেদিন বলে ফেলেছিল······

কথাটা আবার মনের মাঝে ছবি নিয়ে ফুটে ওঠে।

মেয়েটি চলে যেতে বলি, তোর তো বেশ বৌ হয়েছে রে অশোক—ভারি সুন্দর ..

বসা-চোখদুটো তুলে ও বলে, হ্যাঁ। খুব ভাল মেয়ে ..

তারপরে কথার সুর বদলে যায়। কান্নার মতো একটা ভেজা আওয়াজ বেরিয়ে আসে।...বলে, কিন্তু আমার হাতে ওর জীবন বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেলো। এক বছর বিয়ে হয়েছে আমাদের—প্রায় এক বছর ধরেই বিছানায় পড়ে' আছি—ওকে তো আমি কিছু দিতে পারিনি আজো। হয় তো পার্‌বোও না কোনোদিন—

বল্‌তে বল্‌তে হঠাৎ থেমে যায় ..

গলা বুজে আসে বুঝি—

উস্কো খুস্কো ঝাঁকা ঝাঁকা চুলগুলোর উপর একটা হাত থুই—

কি বলা যায়—মনে আসে না।...

মিথ্যে সান্ত্বনাটা ঠোঁটের সীমায় এসে বেঁধে যায়।

তবু মামুলি একটা উত্তর দিতে হয়—

বলি, এর চেয়ে শক্ত ব্যামো কি কারো হয় না ?

অশোকের ঠোঁটে একটু শুকনো হাসি খেলে।

বলে, হয় না—তাইকি বল্‌ছি ? তবে তারা আর বাঁচে না—এই যা।

আরো কি বল্‌তে যায়—বলা হয় না।

মেয়েটি এসে পড়ে—

যেন কান্নার সাগরে একটি শুভ্র শতদল ভেসে আসে

ধীরে ধীরে অশোকের গায়ের কাপড়টা বেশ করে টেনে দেয়।

তারপরে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কী সে আকুল দৃষ্টি!—আমি ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ি—

থেকেই যেতে হয়—

যদি বন্ধুকে বাঁচিয়ে তুল্‌তে পারি।

কিন্তু ভেতর থেকে বল পাইনে একটুও।...

মেয়েটির দিকে তাকাতে দুঃখু হয়—

ওর বিধবা মূর্ত্তিটা যেন চোখের ওপর দাগা দিয়ে বেড়ায়।

চোখ-বসা, হাড়গোর বের-করা একটি কঙ্কাল মূর্ত্তি......

পরণে শুভ্র থান-কাপড়—হাতদুটি খালি...

সমস্ত দেহ জুড়ে একটা সর্ব্বহারার ছাপ—

যেন একটা ন্যাড়া বেল গাছ—সন্ন্যেসী, বৈরাগী—ফল আছে—পাতা নেই......যেন শীতের নিঃশ্বাসে ঝরা-পাতা মরা ফুলের একটা ডাল।

দিনের পর দিন যায়...

দূর কাছে আসে—

পর আপন হয়।

মেয়েটির সঙ্গেও পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে...

ওর বেদনা যেন আমি বুঝি—

বুক দিয়ে বুঝ্‌তে চেষ্টা করি—প্রাণ দিয়ে চাই......

রাতের পর রাত কাটে।...

রুগ্নের শিয়রে বসে দু'জন জাগি'—দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে। ও বলে, এবার ঘুমুতে যান, অসুখ কর্‌বে যে।

আমি বলি, অসুখ তো কেবল আমাকেই চেনে না।

ও একটু হাসে—

ভোরের তারা যেমন ক'রে দিনের আলোর পানে চেয়ে হাসে। বেলা-শেষের পড়ন্ত আলো যেমন করে সন্ধ্যা-তারার দিকে চেয়ে হাসে—

যেমন করে—

বাড়ীর সাম্‌নে মস্ত একটা মাঠ—বাঁজা...

দুপুরের রৌদে একটা প্রকাণ্ড তপ্ত তাওয়ার মতো দেখা যায়। আগুণের শিস্ ওঠে যেন—

তারি উপর দিয়ে পাড়ি দিয়ে আসি ভিন্‌-গা থেকে ডাক্তারকে খবর দিয়ে—

পা দুটো যেন জ্বলে গেছে।

ভেতরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে থেমে পড়ি—

ভেজানো দরজার ভেতর দিয়ে দেখি,—দুটি লিক্‌লিকে হাত দিয়ে অশোকের গলাটা জড়িয়ে ধরে তার বুকের ভেতর মুখটা গুঁজে দিয়ে অসাড়ের মতো পড়ে আছে করবী—

মুখটা দেখা যায় না একটুও......

সজল অন্ধকারের মতো চারিদিকে খোলা চুল-গুলো ছড়িয়ে পড়েছে—

বুকের কাপড়টা একপাশে লুটোয়—

সুন্দর দু'টি পুরন্ত বুক প্রিয়তমের বুকে পরশ ছোঁয়ায়......

অশোকের মুখ দেখা যায়......

কান্নার উচ্ছ্বাসে সে ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। দুটি চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু-বেদনা ঝর্‌ছে—

কী অভাবে ওরা কাঁদে—বুঝ্‌তে চাই...

পারিও যেন।

...যার দু'বেলা পেটে খেতে জোটে না, তারি কাছে আর একটি ভুখা-ভগবানের করুণ আর্ত্তনাদ যেন—যার হাতের কাছে কিছুই নাই, নড়বার ক্ষমতাও নাই, তারি কাছে সকল কিছুর দাবী যেন।

যে অক্ষম, সে কাঁদে—
যে বঞ্চিত, সে কাঁদে।

বেবাক্ কথা বল্‌তে পারে না—

মাঝে মাঝে ভেজা ভারী আওয়াজটা গলায় ঠেকে যায়।

তবু একটু থেমে আবার বলে, জানিস্ তুষিত, মেয়েরা যখন বুঝ্‌তে পারে, আমি নারী, নারীত্ব আমারই, মাতৃত্বে আমারই অধিকার—তখনি তা' ব্যথার নাড়ীতে ফুল ফোটে—বিশ্বের সকল জিনিষ তার চোখে সুন্দর হয়ে ওঠে, অভিনব হয়ে ওঠে—অথচ কী যেন একটু ব্যথার কাঁটা তারি মাঝে তাকে খোঁচা দিতে থাকে। . এ অবস্থায় এসে যদি কোনো অবলম্বণ সে না পায়, তাহ'লে সবকিছু সে করতে পারে।...নারীর বুকে যখন ফুল ফোটে—মা হওয়ার ক্ষুধা নিয়েই ফোটে, নিখিল সৃষ্টির ক্ষুধা...

কথাগুলো খুব পরিষ্কার হয় না—

তবু বেশ ভালো ক'রেই বুঝ্‌তে পারি।

কিন্তু সাহস ক'রে বল্‌তে পারিনে—'আমি কি করবো ?'...

সমস্ত দেহের রক্তগুলো যেন টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটে ওঠে—

মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করে—

রক্তগুলো চিন্‌চিনিয়ে মাথায় উঠ্‌তে থাকে।

অশোকের রগ-বা'র করা শীর্ণ একখানা হাত আমার সবল হাতটাকে চেপে ধরে—

কী বলে ফেলে—এই ভয়ে তার হাতটা ছুঁড়ে দিয়ে ভীত হরিণের মতো ছুটে পালিয়ে যাই।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

জল গাছ ঘর সব এক হয়ে গেছে—

চোখ মেলে চলা আর বুজে চলা এক কথা।

তারি মাঝ দিয়ে ডাক্তারকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসি।

যেন এম্‌নি শুয়ে আছি—

ঘর এম্‌নি তরল অন্ধকারে ভরা।

এই বিছানা, এই আমার বালিশ—

এই বালিশেরই একটি পাশে—আর একটি যেন কেউ ....

আমার কাছে কিছু আবরণ সে রাখ্‌তে চায় না—

হয় তো ঘুমিয়েই পড়ি—

হয় তো স্বপ্ন দেখি—

কিন্তু স্বপ্নের মাঝেই অনুভব করি- কার যেন সাপের মতো দু'খানি শীতল বাহু আমার গলাটাকে বেষ্টন ক'রে ধ'রে—

বাস্তবতার আঘাতে স্বপ্নের ঘোর টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে যায়—

লাফ দিয়ে উঠে বসি।

আলো জ্বাল্‌তে চাই—

হঠাৎ কে চীৎকার ক'রে ওঠে যেন—কাপুরুষ কোথাকার! আলো জ্বেলে আর কত অপমান করবে নারীর......

অন্ধকারের ভেতর দুটি আগুনের গোলা জ্বল্‌তে থাকে যেন—যেন এখনি দু'টি চোখেয় আগুণ লেগে অন্ধকার জ্বলে' উঠ্‌বে......

ও বলে, আমি সন্তান চাই—আমার বৈধব্য জীবনের কলঙ্কিত সন্তান নয়—আমার স্বামীর সন্তান —তুমি জানো, আমার স্বামীর জীবন আর তিন চার দিনের বেশী নয়—

আর কাণে আসে না।

সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসে—

জীবনের এ কি পরীক্ষা ?—এ কি রহস্যের মাঝে ফেল্‌লে ভগবান্—

দেয়ালের ওপাশে মৃতপ্রায় সংজ্ঞাহীন বন্ধু পলে পলে জীবনকে ফুরিয়ে চলেছে—আর এপাশে সমস্ত মাতৃত্বের ক্ষুধা নিয়ে পতিপ্রাণা সতী সন্তান ভিক্ষা মাগে······

•

দিনের আলোয় করবীর দিকে তাকাতে পারি না।

সারারাত অশোকের শয্যাপার্শ্বে বসে জাগি।

একটি বারও করবীর মুখের পানে চাইতে সাহস হয় না। কিন্তু মনে হয় করবী যেন আমার মুখের পানে তাকিয়ে আছে—

সেই বিশাল পবিত্র দৃষ্টি—ভেতরটা পর্য্যন্ত যেন সে দৃষ্টির সাম্‌নে উদ্‌লা হয়ে যায়।

মনের ভেতর কি যেন একটা অতৃপ্ত সুখের ছোঁয়াচ লাগে।

জীবনের ঘুমন্ত মুকুলে ফুল ফোটা যেন······যেন অনাস্বাদিত এক অভিনব অমৃতের পেয়ালার চুমুক—

লাখ' লাখ' জীবন ধরে' পান কর্‌লেও তৃপ্তি আস্‌বে না যেন ·····

বুঝি না—আমি কি হ'য়েছি!

অশোকের লুপ্ত-সংজ্ঞা আর ফিরে আসে না—

করবী শুধু তার দু'টি পায়ের ভেতর মাথাটা গুজে দিয়ে সারা দিনরাত চোখের জল ফেলে।

এত জল ওই দু'টি চোখের ভেতর কোথা থেকে আসে?

এযে একেবারে বন্যা-স্রোত!

কিন্তু কিছুই হয় না—

অশোক একটিবারও সাড়া দেয় না।

মানুষের কান্না বিধাতা-পুরুষের মন্দিরের-প্রাচীরে আঘাত খেয়ে ফিরে আসে······তার কাণে পৌঁছয় না।

একদিন অশোক তার রোগজীর্ণ দেহটা ফেলে রেখে অনন্তের পথে পা বাড়ায়।

করবী তার ফেলে-যাওয়া দেহটাকেই আঁকড়ে ধরে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে থাকে।

মানুষের জোর-জবরদস্তি অইটুকুই।

করবীকে আর চেনা যায় না।

তার যে রূপটা একদিন আমি কল্পনায় দেখেছি—আজ সেইটেই সত্য হয়ে ফুটে উঠেছে।

তবু এই বৈরাগী দেহটাতেই একটা মস্তবড় পরিবর্ত্তন চোখে পড়ে।

এতদিন করবীর যেরূপটা ছিল প্রচ্ছন্ন, সেইটেই আজ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

দেখি, তার দেহের কূল ছাপিয়ে যেন জোয়ার এসেছে—

সবখানেই একটা ছাপ—উদ্ভিন্ন যৌবন আর বসনের শাসন মানে না যেন।

চোখদুটি যেন রাত্রির মতো নিবিড় কালো হ'য়ে উঠেছে।

অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখি।

নিজেকে যেন আর ধরে রাখ্‌তে পারি না—

হয় তো করবী বুঝ্‌তে পারে·········

আমার চোখের মাঝে যে ক্ষুধিত দৃষ্টি ফু'টে ওঠে—সে দৃষ্টি মানুষের নয়·········

ও সব বুঝ্‌তে পারে······

একদিন সন্ধ্যায় এসে বলে, তোমার এবার বিদায় নেবার পালা,—তুমি যাও।

আমি আর পারিনে·········

তবে চোখ দু'টো সজল হ'য়ে ওঠে—

দু'টি ঠোঁটের পাতা কাঁপে······

বুঝি, সে আজ বড় দুর্ব্বল, বড় অসহায়!

বলি, যাবো না আমি একা। তুমিও চল—

হঠাৎ আগুণের মতো ওর চোখ দু'টি জলে ওঠে।

কোনোমতে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বাইরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, যাও—

সে স্বর যেন বজ্রের মতো কেঁপে ওঠে।

এ যেন করবীর কণ্ঠস্বর নয়—

যে করবী একদিন মাতৃত্ব চেয়েছিল,—

এ যেন এক মহিমময়ীর কণ্ঠস্বর—

যার সমস্ত মন সতীত্বের গর্ব্বে—নারীত্বের গর্ব্বে গর্ব্বিত,—যার সারাদেহ একটি শুভ্র পবিত্র আত্মার লীলাস্থল!

এ যেন নারী-করবীর কণ্ঠস্বর নয়—

এ যেন মা-করবীর কণ্ঠস্বর.........

* * * * *

রাত্রি নামে অতল স্নেহের মতো .. ....

বিশ্ব তার কোলে মুখ গুঁজে তলিয়ে যায়।

সমস্ত কোলাহল, সমস্ত হাসিকান্না তারি মাঝে লুপ্ত হয়.........

বেঁচে থাকার ভেতর হঠাৎ মৃত্যুর শীতলতার মাঝে মুক্তি পাওয়া যেন........

চলি আর ভাবি—

এম্‌নি ক'রে মা-করবীরা যুগে-যুগে তাদের দুরন্ত সন্তানদের পথ দেখায়—

হয়তো সে-পথ এম্‌নি ক'রে রাত্রির আঁধারের মাঝ দিয়ে চল্‌তে চল্‌তেই দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হ'য়ে ওঠে একদিন.........

"শরৎ! তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলী"

শ্রী ভারতকুমার বসু

রাণীর-রচা রূপের বনে পদ্মপাতায় পা রেখে'
ওগো শরৎ! আজ কি এলে শিউলী-ফুলে গা ঢেকে?

*

রবির ছবির বন্দনা।
গীতির প্রীতি বন্ধনা।
চিত্ত-বাঁশীর নিত্য-হাসির
বিত্ত বিলায় চন্দনা!

*

বাংলা-দেশে আনলে তুমি মর্ম্মী-মনের সুরভি!
সেই দরদে ছড়িয়ে গেল অশ্রু-করুণ পূরবী!

*

গরীব তুমি, বক্ষে নিলে গরীব জাতির ব্যথা গো!
অমর স্মৃতি কইবে নিতি দীপ্ত যে এই কথা গো!

*

জীর্ণ কুটীর-অঙ্গনে
দুঃখী যেথায় ক্রন্দনে,—
তোমার গাথা হয় যে গাঁথা
দরদ-ভরা চন্দনে।

*

জাতির তরে বাণীর কাছে কণ্ঠে তোমার মিনতি!
ওগো দুখীর দুখের সখা! তোমায় করি প্রণতি!*

---

* অমর কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্দেশ্যে

অমৃত

শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র সরকার বি,এ,সাহিত্য-ভারতী

তপস্যার ফল অমৃত—তপস্যা কামধেনুর ন্যায় সর্ব্বকামদা—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল প্রদান করিতে সমর্থা। তপস্যা পুরুষকারেরই নামান্তর।

পুরুষকারের সাক্ষাৎ জলন্ত মূর্ত্তি মহাত্মা বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র এই পুরুষকারের প্রভাবে একদিন নিয়তি-বন্ধন ছিন্ন ও দেবগণকে পরাস্ত করিয়া ত্রিশঙ্কুর মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছিলেন—তপোবলকে আশ্রয় করিয়াই একটী নূতন স্বর্গ রাজ্যের সৃষ্টি করিয়া, 'দৈব অনতিক্রমণীয়, পুরুষকার দৈব শক্তির নিকট পরাভূত' ইহা একবার অপ্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহারই মুখে একদিন শুনিয়াছিলাম—দৈবং পুরুষকারেণ নিবর্ত্তয়িতুমর্হতি এবং নিজ জীবনের কার্য্যকলাপ দ্বারা স্বীয় উক্তির সপ্রমাণ করিয়াছেন।

সর্গে তপঃ-ব্রহ্মাও তপস্যাকে আশ্রয় করিয়াই এই ত্রিভুবনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় মানব যে তপোবলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তার স্থান অধিকার করিতে সাহসী ও সমর্থ হইয়াছিলেন, সে তপস্যার বল সামান্য নহে। সে তপস্যার বল কোথা হইতে আইসে? সে তপস্যা কি?

তপস্যার অর্থ সাধন বলে আত্মশক্তির বিকাশ। আমাদের মানবাত্মায় অতি উচ্চতম শক্তিসমূহ নিহিত আছে। কেননা, মানবাত্মা ত আর কিছুই নহে, মানবাত্মাই ঈশ্বরাত্মা—আত্মাই ব্রহ্ম। আমার আত্মা ও ব্রহ্ম একই বস্তু।

যে কাম ক্রোধাদি রিপুর উত্তেজনায় আমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, যে মায়া-মোহের আবরণে আমি আমার প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া রহিয়াছি, যদি একবার সাধনা দ্বারা সেই সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সংযত করিতে পারি, যদি একবার কঠোর আত্মসংযম দ্বারা সেই মায়ামোহের আবরণ অপসারিত করিতে পারি, তবে আমার আত্মার শক্তিসকল পূর্ণ মাত্রায় ফুটিয়া উঠিবে, তখন মেঘনির্ম্মুক্ত ভাস্করের ন্যায় আমার আত্মাই ব্রহ্ম-স্বরূপে জাগিয়া উঠিবে। তাই বশিষ্ঠের নিকট পরাস্ত হইয়া বিশ্বামিত্র প্রতিজ্ঞা করিলেন-'ইন্দ্রিয় মনকে সংযত করিয়া আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইব, কারণ, তপস্যাই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের কারণ।'

পুরুষকারের নিকট দৈবশক্তি পরাহত। নিজের ভিতর শক্তি লাভ হইলে চরাচর সকল বস্তুই অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য। "যদি এগুতে চাও তোমাকেই পথ ক'রে নিতে হ'বে। ওপারের দমকল এসে এপারের দাবানল নিভিয়ে দেবে এমন ভরসাটাও যে করে, সে হয় বাতুল, না হয় ভণ্ড!"

মানুষের ভিতর দিয়াই দেবতার বিকাশ হয়, মানুষের ভিতর দিয়াই বিশ্বের অনন্ত শক্তি ফুটিয়া উঠে। কালের মহাযাত্রার পথে বিশ্ব মানব যে উল্কার বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, সে একটা আদর্শের আশায়। একটা ভাবের প্রেরণায়, একটা মুক্তির সন্ধানে।

সে মুক্তি হয় আত্মশক্তিতে—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—শক্তিমান্ যে শক্তিমানের সঙ্গে তাহার মিলন হয়—দুর্ব্বল তা চায়ও না, পারেও না।

প্রাণবন্ত যে, শক্তি আছে তার। শক্তিমান্ সেই পরম পুরুষকে জানিতে পারে। তাঁহাকে জানিলে

মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় (তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি) —অমৃত লাভ হয়।

প্রকৃত জ্যোতির সন্ধান পাইলে মানুষের সকল অশান্তি, সকল দুঃখ ঘুচিয়া যায়। জীব স্বরূপতঃ দুঃখাতীত, সে আনন্দ-স্বরূপ, আনন্দেই তাহার উৎপত্তি, আনন্দেই তাহার স্থিতি—সে অমৃতের শিশু, চরমেও অমৃতের অধিকারী। অমৃতত্ব তাহার জন্মগত অধিকার। আত্মার স্বাধীনতার উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত।

মানবাত্মা বিশ্বাত্মারই আদি বিকাশ। বিশ্ব-মানবের জগৎ নিতান্তই মানবাত্মার জগৎ। আচার্য্য কবি রবীন্দ্র নাথ বলিয়াছেন,—'যাহা বাস্তবিক বিশ্বের সম্পদ্, তাহা বিশ্ববাসীর আত্মব্যক্তিত্বেই তাহার অস্তিত্ব বিকাশ করিয়া থাকে,—The true univer sal finds its own manifestation in the individual"—Viswabharati Quarterly, Jan. 1934 (Magh 1330) Page 387. বাস্তবিক মানব-ব্যক্তিত্বে যে 'সত্য' নিহিত আছে তাহাতে,আর বিশ্ব-মানবের অন্তরে যে নিত্য 'সত্য' বিরাজমান, তাহাতে কোন পার্থক্য নাই। তাই এক হিসাবে বিশ্বের ব্যক্তিগত মানব তার অন্তর্নিহিত সত্যের সঙ্গে বিশ্বমানবের আভ্যন্তরীণ সত্যের জ্ঞাতিত্ব, একাংশীয়ত্ব লইয়া স্বভাবতঃই যেন বিশ্বকে আমন্ত্রিত করিতে উন্মুখ।

এই অভিন্নতা-বোধেই মানবে মানবে মিলন স্পৃহা, আর প্রেমে সেই মিলনের সম্ভবতা। প্রেমেই অপরের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক, প্রেমেই একের পক্ষে সমস্তের মণ্ডলীতে প্রবেশাধিকার, প্রেমই বিশ্ব আত্মার দ্বার উদ্ঘাটনের উপায়।

'মানবাত্মা তীব্র, উচ্চ, উচ্ছ্বসিত ঋজু কণ্ঠে আপনার মাহাত্ম্য ও বিশ্বমানবের একত্ব ঘোষণা করিতেছে।' নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে, প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তবে বিশ্ব স্রোতে ভাসিয়া চলিতে হইবে।

এ শিক্ষা সেই যুগের, যে যুগে মানুষ মানুষকে ঘৃণার চক্ষে দেখে নাই—মানুষ মানুষকে বিজয়া দশমীর মিলন-সন্ধ্যার মুক্ত হৃদয় নিয়া বাহু বেষ্টনে ধরিয়া কণ্ঠালিঙ্গন করিয়াছে।

এখন আলস্য, জড়তা, ধর্ম্মহীনতা, শঙ্কা ও সঙ্কোচ, কূপমণ্ডুকতা ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হরণ করিয়াছে। এমন একদিন ছিল যখন ভারতবাসী তাহার সম্পূর্ণ 'আমি'র জন্য পাগল ছিল। তাহাকে না পাইয়া তাহার সকল দুঃখ—বুকে জ্বালা, অন্তরে অনন্ত পিপাসা ছিল—আকাশের সমস্ত বারিবর্ষণেও তাহার সে পিপাসা মিটে নাই, জগতের সমস্ত প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি, ধরণীর সমস্ত কুসুম সৌরভময়ী রূপগৌরববতী যুবতী রমণীও সে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিতে পারে নাই। সেই 'আমি' ছিলেন তিনি যিনি অজ্ঞানান্ধকারের পরপারে যেখানে চন্দ্র সূর্য্যের আলোপ্রদানের প্রয়োজন নাই, যেখানে বিদ্যুৎ বিকাশ পায় না, অগ্নির ত কথাই নাই, সহস্র অগ্নিতেজ যাঁহার সম্মুখে নিষ্প্রভ হইয়া যায়, যাঁহার দীপ্তিতে বিশ্বচরাচর দীপ্তিমান্—

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্,
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

এই যিনি, তিনিই ছিলেন ভারতীয়ের সম্পূর্ণ 'আমি'।

সুদূরের এই সুন্দর বস্তু আমাদের চিত্ত হরণ করিয়াছিল। তাঁহাকে চাই-ই। ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, বিরাম নাই—আমাদিগকে সেই বিশ্ব-গতিতে চলিতেই হইবে। ইহাই আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা। বিশ্ব-কবির ভাষায় সেই বৈশিষ্ট্য পুণ ব্যক্ত হইয়াছে,—

> "কে সে? জানি না কে? চিনি নাই তারে,
> শুধু এইটুকু জানি,—তার লাগি রাত্রি অন্ধকারে
> চলেছে মানব-যাত্রী যুগ হ'তে যুগান্তের পানে
> ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে

অন্তর প্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনেছে কাণে
তাহার আহ্বান-গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত্ত-মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব-বিসর্জ্জন।
নির্য্যাতন লয়েছে, সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে, সঙ্গীতের মত। দহিয়াছে অগ্নি তারে,
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে,
সর্ব্ব প্রিয় বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম হুতাশন,
হৃৎপিণ্ড করি ছিন্ন, রক্তপদ্ম অর্ঘ্যউপহারে
ভক্তিভরে জন্ম শোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে,
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ।"

এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শক্তিমান্ মানুষ তাহার সর্ব্বপ্রিয় বস্তুকে ইন্ধন করিয়া তাহারি জন্য চিরকাল হোম-হুতাশন প্রজ্বলিত করিয়াছেন। আমরা ভ্রান্ত, আমরা পরমুখাপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি। এই পরগাছা এতাদৃশ প্রবল হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে যে ইহার আওতায় পড়িয়া আমাদের ঘর বাহির উভয়ই মলিন ও আঁধার হইয়া উঠিয়াছে। স্যার আশুতোষ তাই বার বার বলিতেন—Do not hesitate to own at all times that you are genuine Indians. এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যই জাতির জীবন। ইহাকেই একদিন বিচারপতি উড্রফ্ বলিয়াছিলেন —seed of race. এই জাতির বীজকে মহামহীরুহে পরিণত করিতে হইবে, শঙ্কা, সঙ্কোচ, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতির অনেক উর্দ্ধে আমাদিগকে উঠিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্রোপদিষ্ট সকল বিষয়েরই এই লক্ষ্য—নিজ ক্ষুদ্র গণ্ডী হইতে বাহির হইয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া পরস্পরে ভাব আদান প্রদান করিয়া উদার হইতে উদারতর হওয়া, ক্রমশঃ সার্ব্বভৌমিক ভাবে উপনীত হওয়া। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন—"আমার মতে, জাতীয়তা অর্থ পাশ্চাত্য দর্শন হইতে ধার করা একটা রাজনৈতিক ধারণামাত্র নহে। আমার মতে, প্রত্যেক জাতি উন্নতিশীল। তাহাকে অগ্রসর হইতেই হইবে; কারণ অগ্রসর হওয়া ভিন্ন তাহার আর অন্য উপায় নাই। ভগবানের বিশ্বরাজ্যে মানব জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব নাই, প্রত্যেক জাতি সেরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ বহু জীবনের একটী সত্ত্ব। জীবনের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতিকেই বিস্তৃতি লাভ করিতে হইবে। আমি নিজে যে জাতির অন্তর্ভুক্ত, সে জাতিকে কাজে কাজেই অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা কেবল তাহার বিস্তৃতির সাহায্য করিব। আমি নিরপেক্ষতাকে এবং ধর্ম্মকে যেরূপ শ্রদ্ধা করি জাতীয়তার এই নীতিকেও আমি তদ্রূপ শ্রদ্ধা করি। দেশের কাজ করা, জাতির কাজ করা মনুষ্যত্বের সাধনা। মনুষ্যত্বের সাধনা ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য করা।"

এই জন্য চাই নিজের শক্তির উপর প্রবল বিশ্বাস—প্রত্যেককেই বিশ্বাস করিতে হইবে যে অনন্ত শক্তি আমাদের সকলের আত্মার মধ্যে বর্ত্তমান। সে শক্তির বলে আমরা অমৃতের অধিকারী হইব।

বেদ বলিতেছেন, "আশিষ্ঠো, বরিষ্ঠো, দ্রঢ়িষ্ঠো মেধাবী" যুবকগণই ঈশ্বর লাভ করিবেন। যেহেতু, তাঁহারা মানবজীবনের নিত্যসহচর আপদ বিপদ, বাধাবিঘ্ন, দুঃখ দৈন্য বীরের মত আত্মবলে অতিক্রম করিয়া স্বীয় গন্তব্যস্থানে উপনীত হন। তাঁহারা নিয়ত সুখের আশা করিয়া দুঃখের ফাঁসে আবদ্ধ হন না। তাঁহাদের মনের কামনা—

"দেও লক্ষ দুঃখ শোক,
লক্ষ লাজ ভয়,
দেও দৈন্য প্রতিদিন
নব বিঘ্নময়;
তুচ্ছ ব'লে সবে আমি
করিব জ্ঞায়ান
শুধু চাই প্রাণ।"

এই প্রাণ শিক্ষা ও ধর্ম্মজ্ঞানের সম্মিলিত ফল্।

আমরা হিন্দু—হিন্দুর মজ্জাগত বিশ্বাস যে, দেহের নাশে জীবনের নাশ হয় না। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও অনন্ত, অতএব যখন মৃত্যুই নিশ্চয় তখন এস, একটী মহান্ আদর্শ লইয়া উঠাতেই সমগ্র জীবন নিয়োজিত করি। জাতির কল্যাণের জন্য আত্মবলিদানই জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম। ভগবান্ আমাদের সহায় হইবেন, কেননা, তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—'আমি নিজ জনের পরিত্রাণের জন্য বার বার ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া থাকি।'

কবি গাহে বেদনার গান

শ্রী সারদাচরণ রায়, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য-ভূষণ

কবি গাহে বেদনার গান
মধুপ বীণার তারে উদাসী পরাণ
কাঁদে নিরাশায়, ধরণীর সর্ব্বহারা—
সহস্র কাঁটার ঘায়ে, বিক্ষত এক তারা
নব নব সুরে উঠে বেজে, অনন্ত পথের লাগি ;
সাথে লয়ে পথিক পবন, রজনীর সাথী
চাঁদ জাগে একা, আঁধিয়ার নভোনীলিমায়
কার লাগি বেয়ে চলে, বিবাগীর তরণী হায়
বিক্ষুভিত তরঙ্গের বুকে, সুদূরের যাত্রী সে যে
আঁখি জলে গাঁথে মালা, মানবের ক্লেশে,
বাঁশী তার থাকে নাকো বারোমাস
সিন্ধু-বন-গিরি লঙ্ঘি, পশে তারি কলভাষ
প্রভাতে কানন-প্রান্তে ফুটায়ে রক্ত শতদল
যৌবন-বেদনা রসে, উদ্বেল-উচ্ছল—
কবি রচে চিরন্তন দুখেরি গান
অবিরাম নিতি অফুরান্।
যে অস্পষ্ট বাণী শিশু ধরে ওষ্ঠাধরে
জননীর স্তন্যপানে যেই সুধা সন্তানের লাগি ক্ষরে
দুর্লভ ব্যথায় ; গন্ধ যেথা কেঁদে মরে কুঁড়ির ভিতর
আপনাতে আপনি বিকাশি,কুসুমে করিছে অমর,
শিল্পীর চয়নের সাঝি ভরি
দিবস শর্ব্বরী ;—
যে কথা চাতকের মুখে রচে 'ফটিক্-জল্'
এক বিন্দু বারি লাগি ধরা টলমল্
দাহনের রুদ্র তালে, কবি গাহে বসন্ত বাহার
দক্ষিণের আবাহনী কোমলতার ;
তারি অঙ্গে ধূপ ছায়া খেলে যায়
উন্মাদ নর্ত্তনে ; কবি শুধু ফিরে চায়
ধূলিম্লান ধরণীর কুটীরের পানে
নিঠুর কালের দণ্ড আঘাতই যে হানে,
প্রবল বাত্যায় মরিয়া-মানব নিদারুণ দুখে
যুগে যুগে আশাবাতি আবরিয়া বুকে
চলিয়াছে অনির্দ্দিষ্ট পথ, বলাকার মত,
অশ্রান্ত কল্লোলে অবিরত
জাগে মহাক্ষুধা—
তারি তরে কবি রচে অশ্রুর মুকুতা।
নারী যাহা ঢাকে গোপনে
অন্তরের অন্ধকারে, মনে মনে মনে
প্রিয়তম লাগি যে মালা গাঁথে একেলা
পূর্ণিমার রাতে, শূন্য শয্যা পরে উতলা ;—
কার বেনু ভাষা শুনি উঠে চমকি
যে জন গিয়াছে চলে ফের আসিবে কি !
নিশান্তের অতিসার বিকাশ শুধু
ওগো বিরহী বঁধূ ! মুছে ফেল আঁখির কাজল
স্বপ্ন তব ভুল, সে শুধু মিলনের ছল,
ভাষা হয়ে ফুটে তাই মম বাঁশী সুরে
বেদনার ইতিহাস, বাঁধিয়াছে মোরে
আজন্ম প্রিয়া, প্রণয়ের সখী ব্যথা ;
তারি তরে রচি মোর দুখেরি গাথা
উচ্চৈঃশ্রবা সম ধরিয়াছে জীবনের রথ'
কবি সে যে ভাব-গঙ্গার নব-ভগীরথ।

শ্রী গীর্ব্বাণ

কোন দেশে সভ্যতার অভাব তখন হয়, যখন সেখানে কোন আইন কানুন না থাকে, কোন রূপ সামাজিক বা নৈতিক বিধি প্রচলিত না থাকে বা কেহ তাহা মানিয়া না চলে। বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য-জগতেও তাহাই হইয়া পড়িয়াছে। সত্য কথা বলিতে গেলে যেখানে দাম্ভিকতাপূর্ণ উত্তর পাইতে হয়, অভদ্রোচিত গালি শুনিতে হয়, তাহাকে অরাজকতা বই আর কি বলিব? অরাজকতার ভয়ে—চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, এই খাটি সত্য গোপন করিতেই হইবে। নতুবা ঘাতকের হস্তে উদ্যত তীক্ষ্ণ অসি কোন্ মুহূর্ত্তে গলার উপর পড়িয়া মাথা ও ধড়টার মধ্যে একটা চিরবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিবে।

সাহিত্যের সমালোচনা আজ-কাল গালাগালিতে, পর্য্যবসিত হইতে চলিয়াছে। সাহিত্যালোচনা জ্ঞানার্জ্জন বা জ্ঞানদান নহে, ইহা একটা ব্যবসাদারী হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, যে যত বেশী গালি দিতে, কুৎসা রটাইতে পারিবেন তার কাগজ তত বেশী চলিবে। অতি অল্পসংখ্যক লেখক আছেন, যাহাদের লেখা সদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত—পড়িলেই মনে হয় যে, একটু নূতন কিছু জানিলাম ও শিখিলাম। নবজীবন, নব্যভারত, বঙ্গদর্শন, বান্ধব, প্রবাসী প্রভৃতি মাসিকে সমালোচকের যে সকল গুণ থাকা সঙ্গত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমানের অভদ্রোচিত গালাগালি দেওয়া সমালোচকগণ কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহার বিচার করিবার লোক বঙ্গ-সাহিত্য জগতে থাকিলেও তাঁহারা সুবিচার করিতে অসমর্থ। কেন না দুর্ব্বৃত্তকে কে না ভয় করে?

বর্ত্তমানে সাহিত্যের যে যুগ আসিয়াছে তাহাতে মনে হয়—"সাচ্চা কহে তো মারে লাঠ্ঠা, ঝুটা জগৎ ভুলায়, গোরস গলি গলি ফিরে সুরা বৈঠল্ বিকায়।" সুতরাং সত্য বলিলে পৃষ্ঠে লাঠি পড়িবেই।

চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বা মহর্ষি দুর্ব্বাসার ক্রোধ রিপু প্রবল ছিল। এই কলঙ্ক বা ক্রোধের কথা বলিতে অধিকারী সকলেই—বলেও। কিন্তু যদি আজ দুর্ব্বাসা অথবা তাঁহার শিষ্যবর্গ জীবিত থাকিতেন তবে ফল কি হইত কে জানে? বিশ্বকবির 'শেষরক্ষার' কতক অংশ কেন শনিবারের চিঠির মণিমুক্তায় স্থান পাইল না সে সম্বন্ধে লিখিতে যাওয়ায় "ভাঙ্গ খা'ন ভবানন্দ নেশা হলো নিধের" মত পুষ্প-পাত্রের সমালোচক 'নগণ্য', 'অর্ব্বাচীন', 'বর্ব্বর ভাষা' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করিতে চাহিয়াছেন। তাহাতে উক্ত সমালোচকের স্বরূপটী প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র পুষ্পপাত্রে এবার পলাশ পুষ্প স্থান পাইয়াছে।

কেহ যদি বলেন—"নিন্দা নাহি করি, করি মাত্র স্বরূপ বর্ণন।" কি অন্যায় হইবে তাহার যদি কেহ মনে করে যে "পাট" বা "বহুকাল পড়া পুথির" সহিত মেয়েদের উপমা দেওয়াটা পাঠকের মনের সাহত খাপ্

খায় না, এবং তাহা উপাদেয় নয় বা আর্ট সেখানে ফুটিয়া উঠে নাই। যে দৃশ্য দেখিলে, বর্ণনা শুনিলে বা পাঠ করিলে শরীর ও মনের পুলক ও সন্তোষ জন্মে, তাহাই তো সাত্ত্বিক বা উপাদেয় ভাব। তাহা ছাড়া যাহা রাজসিক ও তামসিক তাহা নিকৃষ্ট। বহু কাল পড়া পুথির বর্ণনায় কোন্ ভাব মনে জাগে, তাহা সমালোচক বলিবেন কি? নিজের মনকে চোখ্‌ঠার দিতে পারা যায় কিন্তু অন্য সকলে তো আর অন্ধ নয়? মানি তিনি বিশ্বকবি। তিনি হয়তো Horizon এর সীমারেখার বেড়াটা ফাঁক করিয়া সুদূরের একটা অনির্ব্বচনীয়, অচিন্তনীয়, অনাস্বাদিত পূর্ব্ব, পবিত্র, সুন্দর হইতেও সুন্দরতর, মধু হইতেও মধুর কিছু আমাদের গোচরীভূত করিয়া নয়ন মনের তৃপ্তি সাধন করিয়া বরেণ্য হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার একটা দিক দেখিয়া অন্য দিকের কিছু চক্ষুর সম্মুখে পড়িলে, ঢাকিয়া রাখিব কি? যখন বিশ্বকবির প্রথম জীবন হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সাহিত্যের দান সম্বন্ধে আলোচনা হইবে, তখন তাঁহার লেখার সমালোচনাগুলি বাদ পড়িবে কি? পুষ্পপাত্রের সমালোচক যেন বিশ্ব কবির লেখার পূর্ব্বাপর সমস্ত সমালোচনা পাঠ করিয়া ভবিষ্যতে সমালোচনা করিতে ব্রতী হয়েন। নতুবা যদি তিনি "নগণ্য অর্ব্বাচীন, বর্ব্বর" প্রভৃতি নিজস্ব ভাষা লইয়া আত্ম-প্রকাশ করেন তবে অন্যের পক্ষে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাই সঙ্গত হইবে।

বয়োবৃদ্ধ হইলেই লোক জ্ঞানবৃদ্ধ হয় না বা বয়োকনিষ্ঠের জ্ঞান থাকিতেই পারে না তাহাও নহে। যে সমালোচক আজ 'নগণ্য' বলিতেছেন তিনিও একদিন নগণ্য ছিলেন, হয়তো বর্ত্তমানে গণ্য হইয়াছেন। মানুষ যে কতবার জ্ঞানী ও কতবার মূর্খ হয়, তাহার ইয়ত্তা আছে কি? কিন্তু আমার মনে হয় সমালোচক আজন্ম গণ্য ও জ্ঞানী অর্থাৎ শুকদেব গোস্বামীর দ্বিতীয় সংস্করণ (!) হায় সমাজপতি! হায় প্রবাসী সম্পাদক! এবার আপনাদের আসন বুঝি টলিল!!

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত

শ্রী রাসমোহন চক্রবর্ত্তী বিদ্যাবিনোদ

সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক। তৎকালে অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত কৃষ্ণনগরের রাজা-দিগের নিকট হইতে 'ব্রহ্মোত্তর' লাভ করিয়া অতি স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের চরিত্রে এমন একটা সরল তেজস্বিতা ছিল যে তিনি কিছুতেই কাহারও নিকট হাত পাতিতে পারিতেন না, আর্থিক অস্বচ্ছলতা স্বত্বেও তিনি অধ্যাপনার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কোন ধনীর দ্বারে প্রার্থী হন নাই। সহরে থাকিলে অভাব ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়, বিশেষতঃ প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির বাহুল্যে মন স্বতঃই বহির্ম্মুখী হইয়া পড়ে। এই জন্য তিনি নবদ্বীপের প্রান্তভাগে নির্জ্জন স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মনের সুখে ন্যায় শাস্ত্রের চর্চ্চায় দিন কাটাইতেন। সাধারণ লোকে মহত্ত্বের মর্য্যাদা কি বুঝিবে? তাহারা রামনাথকে 'বুনো রামনাথ' বলিয়া ডাকিত।

রামনাথ নিজকে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। একবার যে তাঁহার নিকট অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিত সেই নিজকে ধন্য মনে করিত এবং চারিদিকে তাঁহার অধ্যাপনার খ্যাতি বিস্তার করিত। রামনাথের

কুটীরের সেই সাধারণ খাদ্যগ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে বহু ছাত্র তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। তৎকালে বিদ্যা চর্চ্চায় যথার্থ অনুরাগ ছিল।

রামনাথ তাঁহারই উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী লাভ করিয়া ছিলেন। একখানা গ্রন্থিযুক্ত লাল-পেড়ে কাপড় ও এক গাছি লাল সূতামাত্র হাতে জড়াইয়া সধবার পরিচয় দিয়াও তিনি রামনাথের সহধর্ম্মিণী বলিয়া কত যে গর্ব্ব হৃদয়ে পোষণ করিতেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। একদিন রামনাথের স্ত্রী নদীর ঘাটে জল আনিতে গিয়াছেন। দৈবাৎ সেই দিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সস্ত্রীক নৌকারোহণে সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। রামনাথের স্ত্রীর জল ভরিবার কালে কিছু জল ছিঁটিয়া রাণীর গায়ে লাগিল। এক গাছি লাল সূতা মাত্র হাতে জড়াইয়া যে সধবা পরিচয় দেয় তাহার যে রাণীর গায়ে জল ছিটান কত বড় অন্যায় স্পর্দ্ধা হইয়াছে ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়া রাণীর দাসীগণ রামনাথের স্ত্রীকে বারংবার গালি দিতে লাগিল। স্বামীর গৌরবে গৌরবান্বিতা পত্নী একটু হাসিয়া বলিলেন 'এই হাতে এই লাল সূতাটুকু আছে বলিয়া এখনও নবদ্বীপের মান রহিয়াছে।'

কথাটা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কাণে গিয়া পৌছিয়া ছিল। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন ইনি রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের পত্নী। মহারাজ অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়া নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের চতুষ্পাঠী দেখিতে চলিলেন।

অরণ্যকল্প একটি নির্জ্জন স্থানে কুটীরে বসিয়া রামনাথ অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে অত্যন্ত মোহিত হইয়া তাঁহার এই দৈন্য দূর করিবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কি কোন অনুপপত্তি আছে?" ন্যায় শাস্ত্রে 'অনুপপত্তি' শব্দটির অর্থ মীমাংসার অসামর্থ্য। অনুপপত্তি শব্দটির সাধারণ অর্থ অভাব। রামনাথ উত্তর দিলেন, "আমার নিকট ন্যায় শাস্ত্রের কোন বিষয়েরই অনুপপত্তি নাই। আমি সমস্ত ন্যায় কূটেরই মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছি।" তখন মহারাজ তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সাংসারিক কোন অভাব আছে কি?" সহজ সরল হাস্যে পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "মহারাজ' আমার সাংসারিক কোন অভাব নাই সম্মুখে যে সামান্য জমি রহিয়াছে উহার উৎপন্ন অন্নেই আমাদের জীবিকানির্ব্বাহ হয়। আর এই যে তেঁতুল গাছটি দেখিতেছেন ইহার পাতায় গৃহিণী অতি সুস্বাদু টক্ প্রস্তুত করিয়া থাকেন। আমার আবার অভাব কি?" আমরা plain living ও high thinking এর উদাহরণ খুঁজিতে পশ্চিমের ইতিহাস ঘাটিতে থাকি কিন্তু আমাদেরই বাড়ীর নিকটে অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্যের সহিত নিস্পৃহতার কিরূপ অপূর্ব্ব মিলন ঘটিয়াছিল তাহার জন্য সত্যিকার গৌরব অনুভব করি না।

* * * *

একবার কলিকাতা সহরে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। কলিকাতাস্থিত কোন পণ্ডিতই তাঁহার সহিত আটিয়া উঠিতে পারিলেন না। সকলে রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের নাম করিতে লাগিল। রামনাথ প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তিকে বড়ই ভয় করিতেন। তিনি কিছুতেই আসিবেন না। কলিকাতায় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ধরিয়া পড়িলেন, "আপনি না গেলে যে বাংলার নাম উঠিয়া যায়, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া বেড়াইবে বাংলা দেশে আমার সঙ্গে যুঝিতে পারে এমন পণ্ডিত কেহ নাই।" রামনাথ অগত্যা স্বীকার করিলেন। দিগ্বিজয়ীর সহিত রামনাথের বিচার চলিতে লাগিল। বিচারে দিগ্বিজয়ী পরাজিত হইলেন। রামনাথের নামে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। কলিকাতার বড় লোকেরা তাঁহাকে প্রচুর বৃত্তি দিয়া কলিকাতায় রাখিতে কত চেষ্টা করিলেন! "কলিকাতায় যে গরম এখানে আমার পোষাবে কেন?" এই বলিয়া রামনাথ তাহার জীর্ণ কুটীরে চলিয়া গেলেন। রামনাথ যে গরমের ভয়ে কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছিলেন আমরা যতদিন না সেই গরমকে ভয় করিতে পারিব ততদিন ভারতীয় সারস্বত সাধনায় পুণ্য আদর্শের মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব না।
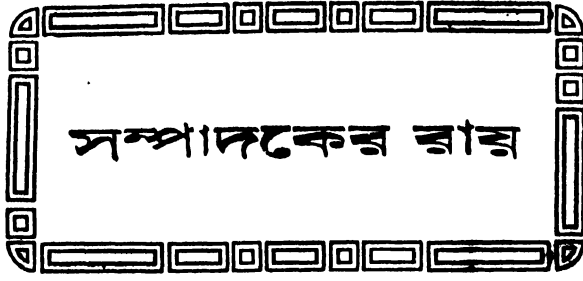
প্রজাস্বত্ব আইন

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিদ্যমান। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাঙ্গালায় জমিদারদিগকেই ভূস্বামী বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যে প্রজাস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে প্রজাদিগকে তাহাদের জোত জমিতে কায়েমি স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে। উহাই দখলী স্বত্ব নামে অভিহিত। ঐ আইনে প্রজাকে তাহার জোতের জমা হস্তান্তরিত করিবার এবং জমিস্থিত বৃক্ষাদি ছেদন করিবার অধিকার প্রদত্ত হয় নাই। অনেক জমিদার চৌথ লইয়া প্রজাকে ঐরূপ অধিকার প্রদান করিতেন। অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয়ে জমিদারের অত্যাচার বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রজা ইচ্ছা করিলে গ্রামের জলকষ্ট নিবারণের জন্য জমিতে পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিতে পারিত না। কিন্তু এবার প্রজাস্বত্ব আইনের যে সংস্কার সাধিত হইল, তাহার ফলে প্রজা এবং কোর্ফা প্রজা যথেষ্ট অধিকার লাভ করিল। তাহা এই :—

(১) দখলীস্বত্ববিশিষ্ট প্রজা তাহার দখলীয় জমি বিক্রয় করিতে পারিবে। তবে বিক্রয়-মূল্যের শতকরা ২০ টাকা হারে জমিদারের খারিজ দাখিলের সেলামী দিতে হইবে।

(২) কোর্ফা প্রজার জমিতে স্বত্ব হইল। যদি ১২ বৎসরের অধিক কালের জন্য কোর্ফা প্রজাকে কোন জমি পাট্টা করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে কোর্ফা স্বত্বের মূল্যের উপর শতকরা ২০ টাকা বা খাজানার ৫ গুণ টাকা জমিদারের সেলামী-স্বরূপ মায় পাঠাইবার খরচ প্রদত্ত না হইলে ঐ পাট্টা রেজেষ্টরী করা হইবে না। যেই জোতের কিয়দংশ বিক্রীত হইবে, সেই ক্ষেত্রে ঐ অংশের খাজানার অনুপাতে জমিদারের সেলামী নির্দ্ধারিত হইবে।

(৩) প্রজা তাহার দখলী স্বত্ব বিশিষ্ট জমির বৃক্ষাদি ভোগ ছেদন করিতে পারিবে। তবে শাল, সেগুণ, শিশু, গজারী, সুন্দরী, মেহগ্নি এবং তাল বৃক্ষাদির স্বত্ব জমিদারেরই থাকিবে।

(৪) প্রজা তাহার দখলীয় জমিতে পাকা ইমারত নির্ম্মাণ বা পুষ্করিণী খনন করিতে পারিবে।

(৫) বর্গাদার, আধিদার বা ভাগচাষীরা সাধারণতঃ শ্রমিক বলিয়াই গণ্য হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি আধি, বর্গা বা ভাগ নামে পরিচিত পদ্ধতি অনুসারে অপর কোন ব্যক্তিকে জমির উৎপন্ন শস্যের কিয়দংশ দেওয়ার সর্ত্তে চাষ করে তবে সে প্রজা হইবে না। জমির স্বত্বাধিকারী যদি কোন দলিলে ভাগচাষীকে প্রজা বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই বর্গাদার প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কোর্ফা প্রজা একাদিক্রমে ১২ বৎসর কোন জমি চাষ করিলে, উহাতে তাহার দখলী স্বত্ব জন্মিবে।

(৭) সম্পত্তি অদল বদল ব্যাপারে শতকরা ৫ টাকা এবং দান ব্যাপারে ২০ টাকা সেলামী দিতে হইবে।

(৮) রায়ত যদি কোন জমি হস্তান্তর করিতে যায়, তাহা হইলে সে জোত ক্রয়ে জমিদারের প্রথম অধিকার থাকিবে। জোত জমি বিক্রয়ের দুই মাস কাল মধ্যে জমিদারকে ঐ জমি ক্রয় করিতে হইবে। নতুবা পরে কিছুই করিতে পারিবেন না।

(৯) স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুযায়ী পোষ্ট্যাল মণি-অর্ডারে খাজানা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(১০) সমুদয় সরিক জমিদার ও সমুদয় সরিক প্রজার সম্মতি ব্যতীত কোন জোত বিভাগ বা খাজানা বাটোয়ারা অসিদ্ধ হইবে।

(১১) জমিদার যদি খারিজ দাখীল বাবত আমানতি টাকা ৫ বৎসরের মধ্যে তুলিয়া না নেন, তাহা হইলে তিনি আর ঐ টাকা পাইবেন না; ঐ টাকা জেলা বোর্ডকে প্রদত্ত হইবে।

বর্ত্তমান আইনে প্রজার কি সুবিধা অসুবিধা হইল সে বিষয়ে আমরা আগামীবারে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষা

বাঙ্গালা দেশের গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটী বিল্ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক (Compulsory) হোক ইহাই বাঙ্গালায় জনসাধারণের ইচ্ছা। এরূপ শিক্ষা-বিস্তারে বহু অর্থের প্রয়োজন। সেজন্য, গভর্ণমেণ্ট ট্যাক্স বসাইয়া এক কোটি টাকা তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই ব্যবস্থায় চাষীরা তাহাদের দেয় খাজানার প্রতি টাকায় এক আনা হিসাবে এবং জমিদার তাঁহার প্রাপ্য খাজানার ফি টাকায় এক পয়সা হারে দিবেন। প্রজা ও জমিদার ছাড়া যাহারা অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করে তাহাদের উপর ট্যাক্স বসাইবার অধিকার থাকিবে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের।

বঙ্গের দৈন্য পীড়িত ও নানা করভারে জর্জ্জরিত প্রজার উপর আবার ট্যাক্স—বোঝার উপর শাঁকের আঁটি। ভারত সরকার ইচ্ছা করিলে দরিদ্র প্রজার দায়িত্ব অনেকটা হ্রাস করিয়া দিতে পারেন। বঙ্গের রাজস্ব যাহা আদায় হয় তাহার অধিকাংশ যদি ভারত গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টকে দেন তাহা হইলে বাঙ্গালায় প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তার ব্যাপারে বঙ্গীয় প্রজার অতি অল্পই ট্যাক্স দিতে হইবে। বঙ্গে শিক্ষার জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক কম অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। বঙ্গের লাটের কথায় দেখিতে পাই বোম্বাইয়ে মোট রাজস্বের শতকরা ৬ বিহার উড়িষ্যায় ৫·১, পঞ্জাবে ৩·৬ এবং বাঙ্গালায় ১·৬ অংশ মাত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হয়। বাঙ্গালার দুরদৃষ্ট বই কি! আমরা আশা করি, ভারত গভর্ণমেণ্ট ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ, বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে শিক্ষার ব্যয় বহন করিয়া প্রজার শিক্ষার বিস্তার করিবেন।

আর এক কথা। বাঙ্গালা দেশের রপ্তানী পাটের উপর যে শুল্ক আদায় হয় তাহার পরিমাণ বার্ষিক ৪ কোটি টাকা। গভর্ণমেণ্ট এই ট্যাক্স বসিবার তারিখ হইতে এ যাবৎ ৩৭।৩৮ কোটি টাকা পাইয়াছেন, কিন্তু বঙ্গদেশ ইহা হইতে এক পয়সাও পায় নাই। বাঙ্গালার কৃষকেরা রক্ত জল করিয়া পাট উৎপন্ন করে। উক্ত ট্যাক্সের উপর তাহাদের ন্যায়তঃ দাবী আছে। নূতন করভারে তাহাদিগকে পিষিয়া না ফেলিয়া এই টাকা হইতে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে গভর্ণমেণ্ট ধন্যবাদ-ভাজন হইবেন সন্দেহ নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার পদত্যাগ করিয়াছেন। কলিকাতা স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের প্রফেসার আর্কার্ট সাহেব নূতন ভাইস্-চ্যান্সেলার হইলেন। আর্কার্ট সাহেবের প্রতি আমাদের বস্তুতঃ কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা অশ্রদ্ধা

নাই বটে, তবে বাঙ্গালীর মধ্যে বহু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং উহার কার্য্য পরিচালনে ও পর্য্যবেক্ষণে সুদক্ষ। ইঁহাদের ভিতর হইতে ভাইস্-চ্যান্সেলার নির্ব্বাচিত হইলে স্কুলের ও বাঙ্গালীর গৌরবের বিষয় হইত। বাঙ্গালী স্বয়ং বাঙ্গালীর শিক্ষার ভার লইতে সম্পূর্ণ উপযুক্ত—বাঙ্গালীর কার্য্যে বাঙ্গালীর দাবী ন্যায়সঙ্গত, সুতরাং অগ্রগণ্য হওয়া উচিত।

বস্তু মাত্রেরই দুইটী দিক্ (aspects) আছে। মানুষও এ বিষয়ে বঞ্চিত নহে। সুতরাং শ্রীযুক্ত যদু সরকার মহাশয়ের কার্য্য-প্রণালী যে কেবলই দূষণীয় বা কেবলই গুণসমন্বিত ছিল তাহা নহে। দোষ গুণ নিয়াই মানব-চরিত্র। সরকার মহাশয়ের কার্য্য-কারিতায়ও আমরা সে বিষয়ের সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছি। যাহা হৌক্ যাহা হইয়া গিয়াছে সেজন্য শোচনা করিয়া লাভ কি ?—গতস্য শোচনা নাস্তি। ভবিষ্যতে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যে কর্ত্তৃপক্ষগণ আত্মশক্তির ব্যভিচার না করেন সেজন্য আমরা তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। যাহারা কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া সর্ব্বসাধারণের দুঃখের বোঝা বৃদ্ধি করেন তাঁহারা দম্ভেরই পূজা করিয়া থাকেন। শিক্ষা পরম পবিত্র—প্রজ্ঞার আলোকে লোকের অজ্ঞানান্ধকার দূর করাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষায় বাধাপ্রদান 'মানুষের' কর্ম্ম নহে। আমরা আশা করি বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলার মহোদয় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়াই এ বক্তব্য শেষ করিব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টী বর্ত্তমান সময় শিক্ষাক্ষেত্র কি ব্যবসায়-ক্ষেত্র সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে দেখা যায় কেহ মূলধন লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়, আর কেহ স্বয়ং অর্থ না দিয়া কেবল গায়ে খাটিয়া বখরাদার হয় এবং লাভের অঙ্ক গণনা করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টী কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা বিবেচনার বিষয়।

ব্যবসায়ে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কত খানি অগ্রগতি হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। নিম্নে কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া গেল। সময় ও সুযোগ হইলে বারান্তরে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

১। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফিস্—আট টাকা হইতে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া সম্প্রতি পনর টাকায় উপস্থিত হইয়াছে। বৃদ্ধিটা জিওমেট্রিকেল প্রগ্রেসনেই বোধ হয়।

২। (ক) অনুত্তীর্ণ ছাত্রের ক্রস্ লিষ্ট (cross list) পাওয়ার জন্য পূর্ব্বে চারি আনা দিতে হইত এখন তাহা ছয় আনা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় পূর্ব্বের চেয়ে আজ কাল ফেল হওয়া গৌরবের বিষয় হইয়াছে। অনুত্তীর্ণ ছাত্রের অবস্থা লাঙ্গুলহীন শৃগালের মত কিঞ্চিৎ উন্নত! ইহা শ্মশানট্যাক্সের রূপান্তর নয় ত?

(খ) নম্বর (mark-sheet) আনাইতে ২৲ স্থলে এখন ৩৲ টাকা লাগে। কেরাণীবাবুদের শ্রমলাঘবের জন্য বোধ হয়!

৩। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পরীক্ষকগণ প্রায়ই শিক্ষকগণ হইতে নির্ব্বাচিত না হইয়া কলেজের অধ্যাপকগণ হইতে নির্ব্বাচিত হন। স্কুলের ছেলেদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা, আমরা যতদূর বুঝি, বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণেরই বেশী। অধিকসংখ্যক, এমন কি সম্ভব হইলে সকল পরীক্ষকই শিক্ষক সমাজ হইতে গৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে দুইটা লাভ হয়—পরীক্ষা সহজ ও স্বাভাবিক হয় এবং শিক্ষকগণেরও গুণের মর্য্যাদা এবং শ্রমের পুরস্কার করা হয়।

৪। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি মারাত্মক ভ্রম সর্ব্বদাই আমাদের চক্ষে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় আজ কাল ম্যাট্রিকুলেশন ছাত্রদের জন্য কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছে। সে পুস্তকগুলি প্রতি বৎসরই অনাবশ্যক ভাবে ১০।১৫ পাতার জন্য বর্দ্ধিত নবীনাকার ধারণ করে। ফলে, ছেলেদের প্রতিবৎসরই পুস্তকগুলি ক্রয় করিতে হয়। এ গুরুতর ব্যবসায় বটে! স্মরণ রাখা উচিত, দেশের সকল লোকেই মোটা মোটা মাহিয়ানা পায় না, বা ইমারতে প্রাসাদে বাস করে না। অনেককে পুস্তকের টাকার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়।

Printed by Radhaballav Basack At the Narayan Machine Press, Dacca.